মহাবিশ্বে মানুষ
পুস্তকমালা

আমরা কীভাবে চিন্তা করি

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

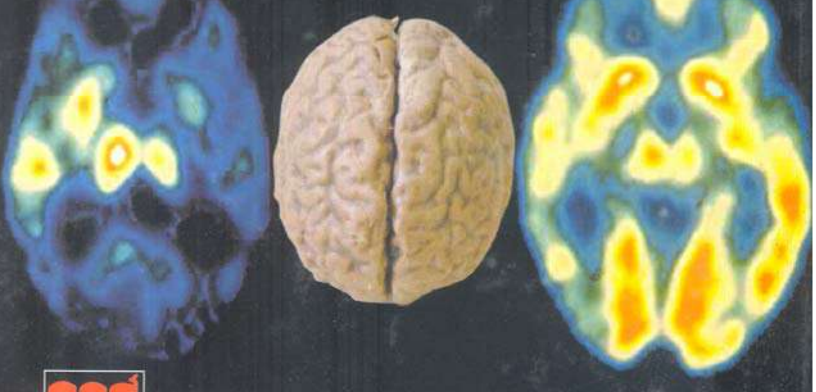

SUBARNA

মহাবিশ্বে মানুষ
পুস্তকমালা

আমরা কীভাবে চিন্তা করি

মানুষ অনন্য জীব, কারণ তার চিন্তার ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু এই চিন্তা জিনিসটি কী, আমরা কীভাবে চিন্তা করি? শরীর, মন, চেতনা ইত্যাদির সম্পর্কের জটিল প্রশ্নগুলোর উত্তর এখনো সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হয়নি। কিন্তু সর্বাধুনিক বিজ্ঞান এ কাজে অনেকখানি এগিয়েছে। এখন আমরা নিশ্চিত যে মস্তিষ্কই সকল চিন্তা-চেতনার আধার, এবং মস্তিষ্কের শারীরবৃত্তের সঙ্গে একে সরাসরি সম্পর্কিত করা ইতোমধ্যে যথেষ্ট সম্ভব হয়েছে। মস্তিষ্কের দ্বারা তথ্যের প্রক্রিয়াকরণই যে চিন্তা– এমন মনে করার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এখন বেশ মজবুত। এদিক থেকে কম্পিউটারের কাজের সঙ্গে চিন্তার মৌলিক মিল রয়েছে, যদিও প্রক্রিয়াকরণের বাস্তবতার দিক থেকে কম্পিউটার আর মস্তিষ্কে আকাশ পাতাল তফাত। চিন্তাকে এখন মস্তিষ্কের বিপুল সংখ্যক স্নায়ুকোষের আরো বহু গুণ সংযোগের জালিকার মধ্যে এক রকম বৈদ্যুতিক সিগন্যালের প্যাটার্ন হিসেবে দেখা হয়। এই সিগন্যালের দ্বারাই মস্তিষ্কের নানা অংশে দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ ইত্যাদির অনুভূতি সৃষ্টি হয়। আবার দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিকে মস্তিষ্কে ধারণ করার সময় এই সিগন্যালের প্যাটার্নটি স্নায়ুকোষের সংযোগগুলোকে বলিষ্ঠ করার মাধ্যমে সেখানে স্থায়ী ছাপ রেখে যায়। ইন্দ্রিয় থেকে আসা অনুভূতি ছাড়া এই স্মৃতিও চিন্তার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে। আমরা কী ভাবে শিখি, বুদ্ধির পরিচয় দিই, তারও প্রক্রিয়া এর মাধ্যমেই বেশ বুঝা যাচ্ছে এখন। শুধু তাই নয় চেতনা ও আবেগের মত কঠিন সমস্যারও বুঝার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান এখন অনেকখানি এগিয়ে গেছে। আমাদের চিন্তার ক্ষমতাকে এই চিন্তারই প্রক্রিয়া উদ্ঘাটনে কাজে লাগাতে পারছি, এটিই বোধ হয় মানুষ হিসেবে আমাদের সব চেয়ে বড় অনন্যতা।

প্রচ্ছদ ॥ মোবারক হোসেন লিটন

পুস্তকমালা

মহাবিশ্বে মানুষ

৪র্থ বই

আমরা কীভাবে চিন্তা করি

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

উৎসর্গ

যাদের সঙ্গে বিজ্ঞান আলোচনা করে সব সময়
অসীম আনন্দ লাভ করেছি,
যাদের অনুসন্ধিৎসু মন ও স্বপ্নভরা চোখ
সর্বক্ষণ অনুপ্রাণিত করে
যুগে যুগে যারা মহাবিশ্বে মানুষের স্থানটিকে
উজ্জ্বলতর করে তোলার প্রয়াস নিয়েছে, সেই-
তরুণ-তরুণীদেরকে

পুস্তকমালার ভূমিকা

প্রাণিজগতে আমাদের যে প্রজাতি তার বৈজ্ঞানিক নাম নিজেরা দিয়েছি হোমো সেপিয়েন্স অর্থাৎ 'জ্ঞানী মানুষ'। অন্য সব প্রজাতিকে ছাড়িয়ে যে অনন্যতা আমরা লাভ করেছি তার বড় প্রকাশ উচ্চতর চিন্তার ক্ষমতা, এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে মহাবিশ্বকে উদ্ঘাটনের চেষ্টা করার আগ্রহ ও সক্ষমতা। নিজেদের ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে আত্মঅনুসন্ধানও এই উদ্ঘাটন চেষ্টার অন্তর্ভূক্ত। আমরা কারা, কোথা থেকে এসেছি, কেমন করে চিন্তা করি, অন্য সবকিছুর সঙ্গে আমাদের কী রকম সম্পর্ক, ভবিষ্যতে কী সংকট ও কী সম্ভাবনাগুলো আসতে পারে – বিজ্ঞান এ সব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবং এখন উত্তরগুলোকে সূক্ষ্মভাবে প্রমাণিত করতে পারছে। সামনে যে তা আরো শাণিত হবে তাও স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। এই পুস্তকমালা এসবকেই সবার জন্য সহজভাবে পরিবেশন করার প্রয়াস নিয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে লেখক এ বিষয়গুলো নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কিছু বিজ্ঞান-বক্তৃতা দিয়েছেন সর্ব-সাধারণের জন্য। 'সবার জন্য সর্বশেষ বিজ্ঞান' নামের এই বক্তৃতাগুলো প্রতি মাসে ঢাকাস্থ বৃটিশ কাউন্সিল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং চ্যানেল আই কর্তৃক টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়েছে। পুস্তকমালার বইগুলো তার ভিত্তিতেই রচিত। একেবারেই সাম্প্রতিক বিজ্ঞান এসব নিয়ে আমাদের জ্ঞানের সীমান্তটি যেখানে এনে দিয়েছে, সকল জটিলতা সত্ত্বেও তাকেই সহজ ভাষায় উপভোগ্য করার চেষ্টা এতে রয়েছে। মহাবিশ্বের ক্রম বিকাশকে বুঝার ও তাতে আত্মঅনুসন্ধানের কিছু স্বাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ও ধরিত্রীর ভবিষ্যতের স্বার্থে আমাদের জীবন ভঙ্গির অনেক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাও এর মধ্যে অনিবার্যভাবে এসেছে। সব মিলে পুস্তকমালাটি আগ্রহী সবার জন্য, বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের জন্য, চিন্তার ও আনন্দের খোরাক যোগাবে বলেই বিশ্বাস।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

পুস্তকমালার অন্যান্য বইগুলো

মহাবিশ্বের বয়স ও আমাদের মহাজাগতিক শিকড়

চারশত কোটি বছরের পৃথিবী ও প্রাণ

আফ্রিকা থেকে জ্ঞানী আমরা

আমরা কী ভাবে চিন্তা করি

উদ্ঘাটিত ডিএনএ, উৎসারিত সম্ভাবনা

জীববৈচিত্র্য ও আমাদের ভবিষ্যৎ

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন

নূতন আবাস, নূতন পড়শির খোঁজে

ভূমিকা

জীবজগতে মানুষের অনন্যতার দাবী প্রধানত তার উচ্চতর চিন্তার ক্ষমতার জোরেই। কাজেই আমরা কী ভাবে চিন্তা করি, কীভাবে এই অনন্যতার অধিকারী হলাম সে ব্যাপারে আমাদের কুতূহল থাকাটি স্বাভাবিক। কিন্তু চিন্তা জিনিসটি মন, চেতনা ইত্যাদির সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে নৈর্ব্যক্তিকভাবে এর শারীরবৃত্তের অনুসন্ধান সহজ হয়নি। তবুও হাজার হাজার বছর ধরে এ চেষ্টা হয়েছে। অনেকে শরীরের সঙ্গে মনকে এবং চিন্তাকে আলাদা রাখার চেষ্টা করলেও মস্তিষ্কই যে সকল চিন্তা-চেতনার আধার শেষ অবধি বিজ্ঞানে সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু মস্তিষ্ক এ কাজটি কীভাবে করে এটিই দুরূহ প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর সর্বাধুনিক বিজ্ঞান কেমন করে দেবার চেষ্টা করেছে তার কিছুটা আমরা এই বইয়ে দেখবো।

বাইরের দুনিয়া থেকে যে সব উদ্দীপক আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পাই সে সব তথ্যের প্রক্রিয়াকরণটিই চিন্তা– এমন মনে করার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এখন বেশ মজবুত। এদিক থেকে কম্পিউটারের কাজের সঙ্গে চিন্তার মিল রয়েছে, যদিও এই প্রক্রিয়াকরণের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কম্পিউটার আর মস্তিষ্কে আকাশপাতাল পার্থক্য। এই মিল-অমিলগুলো লক্ষ্য করলে চিন্তাকে বুঝতে সুবিধা হয়। তথ্য প্রক্রিয়াকরণের স্বাভাবিক পদ্ধতি অনুযায়ী মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে সিগন্যাল রূপে এক একটি কোড বা চিহ্ন এক এক তথ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। এই সিগন্যাল বা কোডের দ্বারা স্নায়ুর উদ্দীপ্ত হওয়ার এক রকম 'আতশ বাজির' মত প্যাটার্নগুলো চিন্তাকে মস্তিষ্কে ধারণ করে ও তার প্রক্রিয়াকরণ করে। চিন্তার প্রকৃতি বা উপাদান অনুযায়ী মস্তিষ্কের নানা অংশে এটি ঘটে, বিশেষ করে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এর উপরিতলে কোর্টেক্সের নানা অংশে– দর্শন, শ্রবণ, বাচন, ইত্যাদির জন্য। স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি মস্তিষ্কে কীভাবে তাৎক্ষণিক কর্মরত স্মৃতির কাজ করে, দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি কীভাবে তাতে বহুদিন ধরে তোলা থাকে, চিন্তার মধ্যে নানা ভাবে কাজ করে এমনি সব প্রশ্নের সুরাহা করা সম্ভব হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই স্মৃতি তৈরি হওয়ার সঙ্গে রয়েছে শিক্ষণের বিষয়টি– সেটি কেমন করে ঘটে তাও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যাকে আমরা বুদ্ধিমত্তা বলি এবং যাকে আবেগ বলি সে সবের প্রকৃত স্বরূপটিই বা কী? এর জন্য মস্তিষ্কে শারীরবৃত্তিক ভাবে কী ঘটছে তা জানতে আমাদের প্রচুর কুতুহল।

আমাদের উন্নত মস্তিষ্ক, উন্নত চিন্তা ক্ষমতা আমরা ধারাবাহিকভাবে কোটি কোটি বছরের জীব বিবর্তনের মধ্য দিয়েই পেয়েছি। তাই বিভিন্ন প্রাণিদের ইন্দ্রিয় অনুধাবন, স্মৃতি, শিক্ষণ, বুদ্ধি, আবেগ ইত্যাদির উপর নানা পরীক্ষণের মাধ্যমে আমাদের নিজেদের চিন্তাকে বুঝাবার সুবিধা হয়েছে। তবে চিন্তার উপর গবেষণায় যুগান্তর সৃষ্টি করেছে সর্বাধুনিক মস্তিষ্ক ইমেজিং পদ্ধতিগুলো যার মাধ্যমে। এতে কার্যত আমরা যেন চিন্তার সরাসরি 'ছবি' দেখতে পাচ্ছি - মস্তিষ্কে কোন হস্তক্ষেপ না করেই।

মানব-চিন্তার অনন্যতায় বড় উল্লম্ফনটি এসেছে মানুষের ভাষার অধিকারী হবার মাধ্যমে। সেটি কী ভাবে ঘটেছে তাও এখন অনেকটা স্পষ্ট। সবক্ষেত্রেই অনেক অগ্রগতি হলেও চিন্তার 'কঠিন প্রশ্ন' হিসাবে এখনো বড় হয়ে থেকে যাচ্ছে আত্মগত চেতনার স্বরূপ উদ্ঘাটনে। একে 'আত্মা' নামে শরীর থেকে আলাদা করে আপাতত এড়িয়ে যাবার চেষ্টা প্রাচীন কাল থেকে চলেছে। কিন্তু এর সত্যিকার বৈজ্ঞানিক উদ্ঘাটন ছাড়া বিজ্ঞানীদের শান্তি নাই। এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রয়াসও রয়েছে এখানে। আমাদের চিন্তার প্রক্রিয়াকে আমরা সেই চিন্তার ব্যবহার করেই উদ্ঘাটন করতে পারছি এটিই বোধ হয় মানুষ হিসাবে আমাদের সব চাইতে বড় সাফল্য।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

সূচিপত্র

পুস্তকমালার ভূমিকা ৫
ভূমিকা ৭
চিন্তার স্বরূপ ১১
মস্তিষ্ক: চিন্তা-চেতনার আধার ২০
গবেষণার উপায়গুলো ৩৪
চিন্তার জানালাগুলো: পঞ্চ ইন্দ্রিয় ৪৩
মস্তিষ্কে স্মৃতির জমিন ৫৫
কীভাবে শিখি ৭০
বুদ্ধিমত্তা কী ৭৫
কল্পনা ও সৃষ্টিশীলতা ৮৮
ভাষা: মানব চিন্তার ভিত্তি ৯৩
আমার চেতনাটিই আমি ১০৩
আবেগের রঙে রাঙিয়ে ১১৪
প্রশ্নোত্তর ১২১

আমরা কীভাবে চিন্তা করি

চিন্তার স্বরূপ

তনু মন প্রাণ

চার শত কোটি বছর আগে পৃথিবীর শৈশবে এখানে প্রাণের উন্মেষ হয়েছিল। আর সেই আদি ক্ষুদ্র এককোষী জীব এই দীর্ঘ সময়ে বিবর্তনের ফলে আজকের সমৃদ্ধ জীব-বৈচিত্রে পরিণত হয়েছে। এই বিশাল জীব জগতের অংশ হিসেবে অন্য সবার মত বিবর্তিত হয়েও মানুষ তার অনন্যতা লাভ করেছে প্রধানত তার একটি বড় ক্ষমতার মাধ্যমে– সেটি চিন্তার ক্ষমতা। চিন্তার ব্যাপারটি মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে এত সমার্থক যে দার্শনিক দেকার্তে বলতে পেরেছেন: 'আমি আছি কারণ আমি চিন্তা করি'।

চিন্তার দায়িত্বটি হলো মনের। কিন্তু সেই মনটি যে কী তা যুগ যুগ ধরে মানুষের কৌতুহলের বিষয় হয়ে রয়েছে। অন্তত হাজার তিনেক বছর ধরে এ নিয়ে বিতর্ক চলেছে। দুটি মতবাদ এ নিয়ে সব সময় স্পষ্ট ছিল, এখনো কিছুটা আছে। একটি মত হলো মন যাই হোক তা শরীরের ব্যাপার নয়, এটি শরীরের থেকে আলাদা একটি স্বাধীন সত্ত্বা। অন্য মতবাদটি মনকেও শরীরের অঙ্গীভূত বলে মনে করে– প্রধানত মস্তিষ্কের কাজের ফলে যার প্রকাশ ঘটে। এ বিতর্কের রেশ এখনো কিছুটা থাকলেও ক্রমেই বিজ্ঞান দ্বিতীয় মতটির দিকেই চলে এসেছে। বিতর্কের রেশ যে থাকতে পারছে তার কারণ মস্তিষ্কের কাজের মাধ্যমে চিন্তা প্রক্রিয়ার অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করা গেলেও এখনো কিছু কিছু জিনিস ব্যাখ্যার বাইরে রয়ে গেছে। সেই ব্যাখ্যা না থাকায় শরীর থেকে স্বাধীন আত্মার ধারণাটি অনেকের কাছে এখনো গ্রহণযোগ্য থেকে যাচ্ছে– যে রকম ধারণা প্রবর্তন করেছিলেন প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক ও প্লেটো। অতীতে যুগে যুগে অনেক দার্শনিক ও বিজ্ঞানী দেহ ও মনকে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষেত্র বলে মনে করে এসেছেন। মন যে শরীর ভিত্তিক, এটি প্রতিষ্ঠিত হতে সময় লেগেছে।

কিন্তু সেই প্রাচীন গ্রীসেই বিখ্যাত চিকিৎসক হিপোক্রেটিস তাঁর চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার ইত্যাদির অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছিলেন সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতি মস্তিষ্কের সঙ্গে সম্পর্কিত। মাথায় আঘাত পেলে কথা শুনতে, বুঝতে, বলতে যে অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে, অথবা দৃষ্টিতে যে বিভ্রম হতে পারে– এসব তাঁর এবং সমসাময়িক শল্যবিদদের সৃষ্টি এড়ায়নি। হিপোক্রেটিস তো পরিস্কার বলে দিয়েছিলেন যে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ভয়, উৎসাহ, উদ্বেগ, সতর্কতা-অসতর্কতা, বুদ্ধি, পাগলামি, নেশাগ্রস্থতা– ইত্যাদি সবকিছুর মূলে রয়েছে মস্তিষ্ক। আধুনিক বিজ্ঞান এই কথাগুলোই অনেক শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়

করিয়েছে বিশেষ করে নিউরোলজি বা মস্তিষ্ক-বিদ্যার অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে।

চিন্তার প্রক্রিয়াকে, এবং মস্তিষ্কের কাজকেও সব সময়েই খুব রহস্যাবৃত বলে মনে করা হতো। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সে রহস্যের আবরণকে অনেকখানি অপসারণ করতে পেরেছে। আজ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকার কিংবা বিশাল বিস্তৃত মহাবিশ্বের রহস্যের ভেতরে ঢুকে আমরা যে ভাবে তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পেরেছি, তেমনি পারছি সেসব নিয়ে আমাদের চিন্তার ভেতরে ঢুকে তাকেও উদ্ঘাটন করতে। এভাবে আমরা এখন মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের নানা সিগ্ন্যালের প্যাটার্নের ভিত্তিতেই চিন্তার নানা দিককে যথেষ্ট সরাসরি ব্যাখ্যা করতে পারছি। শুধু তাই নয় মস্তিষ্কের ইমেজিং এর মাধ্যমে রীতিমত ছবির বা ম্যাপের মত করে চিন্তাকে প্রত্যক্ষও করতে পারছি। একে শরীরের বাইরের এবং ব্যাখ্যার অতীত এমন মনে করে দূরে না রেখে বৈজ্ঞানিক বর্ণনার আওতায় নিয়ে আসতে পারাটি মানুষের বিশাল সাফল্য। তারপরও অবশ্য চিন্তার কোন কোন ক্ষেত্র অনুধাবনের সাফল্য পুরাপুরি আসতে এখনো বাকি– বিশেষ করে চেতনার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা খাড়া করাটি এখনো বিজ্ঞানীদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু অগ্রগতি যেভাবে হচ্ছে তাতে তনু মন প্রাণ সবই যে বিজ্ঞানীদের একই ধারার ব্যাখ্যায় আরো স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ পাবে এমন আশা করা যায়।

'মানুষ কাঠির মতই ভঙ্গুর' এমন কথার জবাবে কেউ একজন বলেছিল 'আমরা কাঠি হতে পারি তবে চিন্তাশীল কাঠি'। সেই চিন্তাশীল কাঠি আবার নিজের চিন্তারই শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যা দিতে পারছে, এর চেয়ে বড় অনন্যতা আর কী হতে পারে?

চিন্তাকে বুঝতে প্রশ্নগুলো কী

আমাদের চিন্তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়– বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষণ, চেতনা, আবেগ– এমনি নানা কিছুর মধ্যে। চিন্তাকে বুঝতে হলে এদের বিভিন্নটির স্বরূপ আলাদা করে বুঝতে হবে, তেমনি এদের মধ্যে ঐক্যগুলোকেও লক্ষ্য করতে হবে। এই বইয়ে আমরা একে একে তাই করার চেষ্টা করবো। আমরা দেখার চেষ্টা করবো ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুধাবনগুলো কী রকমের। বুঝার চেষ্টা করবো স্মৃতি কী, বুদ্ধি কী, আবেগ কী– এমনি সব প্রশ্নকে। এমনকি সব চেয়ে কঠিন যে প্রশ্ন তাও আমরা পরীক্ষা করার চেষ্টা করার চেষ্টা করবো– চেতনা কী? প্রায় সব ক্ষেত্রে চিন্তার

মাধ্যমে আমরা নিজেদের বাইরে থেকে পাওয়া তথ্যকে প্রক্রিয়াকরণ করে তার জন্য উপযুক্ত সাড়া দেবার ব্যবস্থা করি। তবে এই ব্যাপারটি যদি শুধু তাৎক্ষণিক ভাবে পাওয়া তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ হতো তা হলে অন্যান্য অনেক প্রাণি থেকে আমাদের চিন্তা খুব একটি আলাদা রকমের হতোনা। আমরা সাড়া দেবার আগে আমাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ স্মৃতির অনেক ভাল ব্যবহার করতে পারি। এই স্মৃতির অনেকখানি আমরা নানা ভাবে অভিজ্ঞতা বা শিক্ষণের মাধ্যমে মস্তিষ্কে সৃষ্টি করি। তারপর আমাদের সাড়াটি আসে কমবেশি বুদ্ধিমত্তার প্রকাশের সঙ্গে। এর সঙ্গে মেশানো থাকতে পারে আবেগ। সবকিছুর পটভূমিতে থাকে আমাদের চেতনা, বিশেষ করে আত্ম-সচেতনতা। বাইরের কোন তথ্য নিয়ে সাড়া দিই বা না দিই, আমাদের চেতনা সব সময় আমাদেরকে একটি অন্তর্বাচনের মধ্যে রাখে– চিন্তার স্রোতে নিজের মনে মনে কথা বলার মধ্যে। অন্য সব কিছুতেও ভাষা আমাদের চিন্তার বড় অঙ্গ, বড় বাহন। আমরা দেখবো এসব প্রক্রিয়াই চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদেরকে অনন্যতা দিয়েছে। তবে এও আমরা দেখবো যে কোন না কোন ভাবে এগুলো ভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্য প্রাণিদের মধ্যেও রয়েছে। বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় আমাদের পূর্বসূরিদের মাধ্যমে আমরা এসবে অধিক উৎকর্ষ লাভ করেছি মাত্র। আর তা হয়েছে আমাদের বৃহত্তর ও জটিলতর মস্তিষ্কের সুবাদে। আর এই কারণেই আমরা ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্য, আমাদের স্মৃতি– বাইরে থেকে পাওয়া এই সব কিছুকে ছাড়িয়েও নূতন নূতন কিছু সৃষ্টি করতে পারি– যেটি হলো আমাদের সৃজনশীলতা। সৃজনশীলতার প্রশ্ন এলে মানুষ একেবারেই অনন্য।

নানা পশুপাখি বা অন্যান্য প্রাণির মধ্যে চিন্তার ঐ ক্ষেত্রগুলো কী ভাবে কোন পর্যায়ে রয়েছে তার গবেষণা থেকে ব্যাপারগুলো বুঝতে অনেক সহায়ক হচ্ছে।

সবকিছুর মধ্যে আমরা খুঁজে পেতে চাইবো মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের শারীরবৃত্তে চিন্তার ব্যাপারটি কী ভাবে ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে এটি চমৎকার ভাবে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে হয়নি। এসব কীভাবে ঘটে তার এক একটি তত্ত্ব আমরা খাড়া করার চেষ্টা করেছি যা এখন প্রযুক্তির কল্যাণে পরীক্ষায় প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা সম্ভব হচ্ছে। চিন্তায় মস্তিষ্কে যা ঘটছে মস্তিষ্কে তার একটি প্রত্যক্ষ মানচিত্র খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এটি সহজ হয় যখন চিন্তার বিভিন্ন উপাদানগুলোকে মস্তিষ্কে বিভিন্ন স্থানে সুনির্দিষ্ট করা যায়। এ ধরনের স্থানীয়করণ অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হলেও অনেক ক্ষেত্রে আবার উপাদানগুলো মস্তিষ্কে একরকম বিস্তৃত হয়ে ছড়ানো থাকে। আমাদের ইন্দ্রিয়

অনুভূতি, স্মৃতি, বুদ্ধি চর্চা, আবেগ ইত্যাদি অনেকাংশে এরকম একাধারে মস্তিষ্কে স্থানীয় হওয়া ও বিস্তৃত হওয়ার প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে।

চিন্তা যে শারীরবৃত্তীয় বিষয় তা বেশ বুঝা যায় শরীরের উপর মনের প্রভাব দেখে। অসুখ থেকে সারার সময় যদি মন প্রফুল্ল রাখার মত পরিবেশ থাকে তা হলে দ্রুত রোগ সারে। যে জিনিস আসলে ওষুধ নয়, কিন্তু ওষুধ মনে করে তা খেলেও প্রায়শ রোগ ভাল হয় - যাকে বলা হয় প্লাসেবো এফেক্ট। এটি কেন হয় তা এক সময় রহস্যময় থাকলেও এখন বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন কীভাবে প্রফুল্ল মনের সৃষ্ট স্নায়ু সিগন্যাল শরীরের নিজস্ব রোগ সারাবার ক্ষমতাটিকে বাড়িয়ে দেয়।

কম্পিউটারের সঙ্গে তুলনা

কম্পিউটারের যুগের মানুষ হিসাবে আমরা স্বভাবতই আমাদের মস্তিষ্কের কাজকে কম্পিউটারের কাজের সঙ্গে তুলনা করতে চাইবো। আর করবোই না বা কেন, দাবা খেলার মত বুদ্ধির খেলায় কম্পিউটার সব চাইতে তুখোড় মানুষ-খেলোয়াড়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। তাতে কখনো মানুষ জিতেছে, কখনো কম্পিউটার জিতেছে। তা হলে আমরা স্বাভাবিক ভাবেই মনে করতে পারি কম্পিউটারে যেমন কিছু সরল ইলেকট্রনিক বর্তনী অনেক সংখ্যায় থেকে একটি প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করে বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নিতে পারে, আমাদের মস্তিষ্কও হয়তো ভিন্ন ভঙ্গিতে সে রকমেই কাজ করে। একটি মৌলিক দিক থেকে এ কথাটি সত্য, কারণ কম্পিউটার আর মস্তিষ্কের কাজে প্রক্রিয়াগত সাদৃশ্য রয়েছে- উভয়েই যৌক্তিক তথ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমেই কাজ করে, যার বিস্তারিত একটু পরে দেখবো। কিন্তু এই মৌলিক সাদৃশ্যটি ছাড়া উভয়ের মধ্যে সবই অমিল।

ঐ দাবাখেলার মধ্যেই দেখতে পারি কম্পিউটার আর মস্তিষ্কের কর্মকৌশলের মধ্যে কী বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কম্পিউটার দাবা খেলে এক একটি পরিস্থিতিতে কত রকমের চাল হতে পারে তার প্রত্যেকটি অতি দ্রুত দেখে ফেলার মাধ্যমে। তারপর এর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে পাল্‌টা তার প্রতিপক্ষ কত রকম চাল দিতে পারার সেগুলোও সব এটি দেখে ফেলে। সবশেষে এ সবের বিবেচনায় সব চেয়ে মোক্ষম চালটি এটি বেছে নেয়। দাবা খেলার উপযুক্ত সুপার কম্পিউটারের এজন্য রয়েছে বিশাল মেমোরি, আর রয়েছে উচ্চ প্রসেসিং স্পীড যা বিদ্যুৎগতিতে চলে। আমাদের মস্তিষ্ককে যদি এই প্রক্রিয়ায় দাবা

খেলতে হতো তা হলে এটি কখনই পেরে উঠতো না। এর কারণ মস্তিষ্কের সীমিত পরিসরে এতো বেশি 'মেমোরি' সঞ্চিত রাখা সম্ভব নয়। তাছাড়া মস্তিষ্কে স্নায়ুর সিগন্যাল মোটেও বিদ্যুৎ গতিতে চলেনা, এর গতি অনেক ধীর, যা পরে আমরা দেখবো। দাবার চাল দেয়ার সিদ্ধান্ত ওভাবে নিতে গেলে তার অনেক সময় লাগতো। আসলে মস্তিষ্ক কাজ করে অনেক শর্টকাটে, কিছুটা সরাসরি সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়ে। সবগুলো সম্ভাব্য চাল একটি একটি করে পরীক্ষা করার বদলে এটি প্রতিপক্ষের সম্ভাব্য চালটি আন্দাজ করার চেষ্টা করে– সে যেন প্রতিপক্ষের মনকে পড়ার চেষ্টা করে। কম্পিউটারের তুলনায় এখানে পদ্ধতিটি অনেক বেশি জটিল। তাই এই পদ্ধতি উদ্ঘাটনের চ্যালেঞ্জটিও অনেক বড়।

কম্পিউটার আর মস্তিষ্কের আরো অনেক মৌলিক তফাৎ রয়েছে। নেহাৎ বড় কোন বিপত্তি না হলে কম্পিউটার ভুল করতে পারেনা, ভুলে যেতেও পারেনা। মস্তিষ্ক এই উভয়টিই অহরহ করে থাকে। ভুল করা অথবা ভুলে যাওয়া মস্তিষ্কের একটি অঙ্গীভূত প্রক্রিয়া। কাজ করতে করতে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার পরিবর্তন হয় না। কিন্তু মস্তিষ্কে সেটিই নিয়ম। অনেক ক্ষেত্রে স্নায়ুতে সিগন্যাল প্রবাহ বার বার হবার প্রক্রিয়ায় স্নায়ুর বর্তনীই পরিবর্তিত হয়। বিশেষ করে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি মস্তিষ্কে সঞ্চিত হয় এভাবে দীর্ঘদিনের জন্য কিছু কিছু স্নায়ু বর্তনীর স্থায়ী পরিবর্তন হয় বলে। আর তা কোন অস্ত্রোপচার বা হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে ঘটেনা, ঘটে প্রতি নিয়ত সাধারণ চিন্তার মাধ্যমেই। মস্তিষ্কের এক দায়িত্বের অংশ প্রয়োজন হলে অন্য দায়িত্বও নিয়ে নিতে পারে, নিজেই নিজের প্রোগ্রামিং বদলে ফেলে। এজন্য বলা হয় মস্তিষ্ক 'প্লাষ্টিক' জিনিস অর্থাৎ নমনীয় জিনিস– কম্পিউটারের ঠিক বিপরীত।

তারপরও অবশ্য বলতে হবে যে আধুনিক কম্পিউটারকে অন্তত কিছু কিছু ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের অনুকরণে এক রকম উচ্চতর 'চিন্তার' দায়িত্ব দেবার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চলছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে যে প্রচুর গবেষণা চলছে তাতে মস্তিষ্কের বৈশিষ্টগুলোর কিছু কিছুকে কম্পিউটারে আরোপের চেষ্টা চলছে। যেমন সামগ্রিক ভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা, এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রক্রিয়াকরণ সমান্তরালভাবে চালানোর ক্ষমতা (প্যারালাল প্রসেসিং), ইত্যাদি। আর অতি মৌলিক পর্যায়ে কম্পিউটার আর মস্তিষ্কের প্রক্রিয়াগত সাদৃশ্যটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ– মস্তিষ্কও যে মূলত কম্পিউটারের মত তথ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে কাজ করে এটিই অধিকাংশ বিজ্ঞানীর অভিমত।

আধুনিক বিজ্ঞান চিন্তাকে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা হিসেবেই বিশ্লেষণে সচেষ্ট, আমরাও এখানে সেটিই অনুসরণ করবে।

চিন্তা একরকমের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ

তথ্য মাত্রই একটি জিনিসের সঙ্গে অন্য জিনিসের কোন প্রকার যৌক্তিক সম্পর্ক। এখানে সম্পর্কটিই গুরুত্বপূর্ণ, তাই যে কোন সুবিধাজনক বস্তুর সঙ্গে এই সম্পর্কটি ঘটিয়ে ঐ বস্তুটিকে তথ্যের বাহক বা চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন সুপার মার্কেট থেকে পণ্য কিনলে তার উপর লাগানো বার কোডে পণ্যের নানা তথ্য থাকে। পণ্যের সঙ্গে বার কোডের কাগজ বা কালির কোন মিল নাই, কিন্তু পণ্যটির তথ্যগুলোকেই বার কোডের দাগগুলো বহন করে। অথবা আর একটি উদাহরণ নিতে পারি গাছের গুড়ির কর্তিত অংশের উপর রিংগুলোর। এখানে এক একটি রিং গাছটির এক একটি বছর বয়সের প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ বয়সের তথ্যের সঙ্গে রিং এর সংখ্যার সেই রকম যৌক্তিক সম্পর্ক রয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে বার কোড বা গাছের রিং এর বস্তু-গুণের কোন ভূমিকা নাই। ঐ বিশেষ তথ্য বহন করা ছাড়া বস্তু হিসাবে তার অন্য অনেক গুণ থাকতে পারে, যেমন সেই রিংগুলো কাঠের অন্য অংশের কাঠের চেয়ে অধিক আলো শোষণ করতে পারে, সে জন্য তাদের রং অপেক্ষকৃত গাঢ় হয়। নিজের এরকম কোন বস্তু-গুণের ব্যবহার করে তথ্যের বহনকারী ঐ চিহ্ন অন্য রকম আর একটি কাজের কারণ ঘটাতে পারে। যেমন ধরা যাক সেভাবে এমন একটি মেশিন আমরা তৈরি করতে পারি যা গাছের গুড়ির একটি রিং পেলে সঙ্গে সঙ্গে কাগজে একটি কালির দাগ কাটবে। তখন ঐ দাগগুলোও আবার গাছের বয়সের তথ্য বহন করবে। মেশিনটিকে এমনো ভাবে তৈরি করা যায় যে সদ্যকাটা ঐ বড় গুড়ির সব রিংএর জন্য দাগ কাটা শেষ হয়ে গেলে এটি অল্প বয়স্ক একটি ছোট নূতন কাটা গুড়ির রিং দেখে দেখে দাগ কাটতে আরম্ভ করে। মনে করি বড় গুড়িটির হলো ৫০টি দাগ আর ছোট গুড়িটির ১০টি। তা হলে দাগের সংখ্যা দিয়েই ঐ মেশিনটি বলে দিচ্ছে যে বড় গাছটির বয়স যখন ৪০ বছর তখন ছোট গাছটি লাগানো হয়েছিল। এই মেশিনের পুরো ব্যবস্থাকে আমরা বলতে পারি তথ্য প্রসেসর– তথ্য প্রক্রিয়াকরণই যার কাজ। শুধু তথ্যের চিহ্নকে প্রক্রিয়াকরণ করে এটি বাস্তব দুনিয়া সম্পর্কে একটি ফলাফল গণনা করে দিতে পারছে। এর জন্য তথ্যের ঐ চিহ্নের অর্থাৎ গুড়ির রিং এর দুটি গুণ দরকার হয়েছে বয়সের তথ্যটির প্রতিনিধিত্ব করা, এবং তার নিজের কোন বস্তু-গুণের ব্যবহার করে কাগজে

একটি দাগ কাটার ব্যবস্থা করতে পারো। যেমন এমন একটি ব্যবস্থা হতে পারে যাতে একটি ফটো সেল গুড়ির একটি রিং যখন এর সামনে আসবে তখন রিংটির গাঢ় রঙের প্রভাবে অধিক বৈদ্যুতিক কারেন্ট সৃষ্টি করে মোটর ঘুরিয়ে কলমের একটি আঁচড় টানার ব্যবস্থা করবে। এক্ষেত্রে রিং এর সেই বস্তু-গুণ বেশি আলোক শোষণ করাটাকেই ব্যবহার করা হলো।

গাছের গুড়ির রিং যে ভাবে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করলো, এবং তা দিয়ে যেভাবে একটি যৌক্তিক মেশিন বা তথ্য প্রসেসর তৈরি করা হলো, সে রকম অসংখ্য রকম প্রসেসর হতে পারে নানা তথ্যের প্রক্রিয়াকরণের জন্য। গত শতাব্দীতে গণিতবিদ এলেন তুরিং দেখিয়েছেন যে সব রকম তথ্য প্রসেসরের একটি সাধারণ বর্ণনা হতে পারে এরকম: প্রক্রিয়াগুলোর কিসের পর কী হবে তার

সমন্বয়ে একটি প্রোগ্রাম থাকবে, প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজগুলো হয়ে তার ফলাফল আর একটি জায়গায় চিহ্নিত করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। অন্তবর্তী ফলাফলগুলোর উপর কাজ করে এটি আরো অন্য ফলাফল দিতে পারে। এরকম একটি মেশিন যে যৌক্তিক ভাবে সম্ভব তার তত্ত্ব প্রথম দিয়েছিলেন তুরিং, এ জন্য এরকম মেশিনকে বলা হয় তুরিং মেশিন। আমাদের গাছের

গুড়ির রিং গুণে বাস্তব একটি ফলাফল দিতে আমরা যে মেশিনটির কল্পনা করেছি, তাকেও একটি তুরিং মেশিন বলা যায়। কল্পনাটিকে অনেক দূর প্রসারিত করে এমন মেশিনও তৈরি করা যার যাতে একটি মেশিনেই সম্ভাব্য সব রকম তুরিং মেশিনের কাজের সমাবেশ করা যায়– যাকে বলা যায় ইউনিভার্শাল তুরিং মেশিন। তুরিং যে সময় এগুলো বলছিলেন তখন কম্পিউটার ছিলনা। কিন্তু তার কিছুদিন পরেই কম্পিউটার উদ্ভাবিত হয়ে হাতে নাতে দেখিয়ে দিয়েছে বাস্তবেও এমনটি সম্ভব। আজকের কম্পিউটারকে এক ধরনের ইউনিভার্শাল তুরিং মেশিন বলা যায়– যার মাধ্যমে নানা প্রোগ্রামের সাহায্যে বহু রকম তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ করা যায়। চিন্তাকে যদি যৌক্তিক ভাবে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ হিসাবে মেনে নেয়া যায় তা হলে কম্পিউটারের বা যে কোন তুরিং মেশিনের কাজকেও এক ধরনের চিন্তা বলা যায় বৈকি। তুরিং নিজেই একটি কাল্পনিক পরীক্ষার বর্ণনা দিয়ে গেছেন যার মাধ্যমে ঠিক হতে পারে মানুষের ও তুরিং মেশিনের তথ্য প্রসেসিংটি একই রকম কিনা। পর্দার আড়ালে একটি তুরিং মেশিন (কম্পিউটার) এবং একজন মানুষ আছে, আর আমি পর্দার এপারে থেকে উভয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করছি কথা বলার মাধ্যমে, বা টাইপ করে, বা অন্য কোন ভাবে। যদি এটি করার সময় আমি না বুঝতে পারি কখন তুরিং মেশিনের সঙ্গে যোগাযোগ করছি, আর কখন মানুষের সঙ্গে করছি, তাহলে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে উভয়ের তথ্য প্রসেসিং বা 'চিন্তার' মধ্যে বুঝার মত কোন পার্থক্য আসলেই নাই। আজকের অনেক কম্পিউটার এই তুরিং টেষ্টে পাশ করবে বৈকি। সেক্ষেত্রে কী ভাবে বলি যে মানুষের চিন্তার সঙ্গে কম্পিউটারের তথ্য প্রসেসিংএর এদিক থেকে কোন পার্থক্য আছে, যদিও কম্পিউটার ও মানব মস্তিষ্ক বহু দিক থেকেই সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। আসলেও আমরা কম্পিউটারে কাজ করতে গিয়ে এমন ভাবে সেটি সম্পর্কে বলি যেন একজন মানুষের চিন্তার কথাই বলছি। যেমন আমরা বলি কম্পিউটার 'চেষ্টা করছে', সে 'ভাবছে' আগের প্রিন্টারটি রয়ে গেছে, কিন্তু এর মধ্যে প্রিন্টারটি যে বদলে দেয়া হয়েছে এটি সে 'বুঝতে' পারছেনা। এই কথাগুলো কি আমরা নেহাৎ কথার কথা বলছি, না কম্পিউটারের চিন্তা-সদৃশ কাজই আমাদেরকে এভাবে তার মধ্যে চিন্তা আরোপ করতে বাধ্য করছে?

তবে এখনো কেউ কেউ মানুষের চিন্তাকে নেহাৎ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ হিসেবে ভাবতে নারাজ। তাঁদের যুক্তি হলো তথ্যের নাড়াচাড়া করে, পূর্ব নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম অনুসরণ করে চিন্তা-সদৃশ ফলাফল হয়তো পায় যায়, কিন্তু ঐ কাজগুলোকে সচেতন চিন্তা বলা যায়না। তাঁরা এ জন্য এমন কিছু উদাহরণ দেন যা সঠিক

অর্থে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ নয়– কম্পিউটারে বা তুরিং মেশিনে যা হয়। কম্পিউটারে চিন্তা আরোপ করাটি অনেকের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়না, কারণ কম্পিউটারে চেতনার মত কিছু তাঁরা দেখতে পান না। চেতনার সম্পূর্ণ তত্ত্ব এখনো আবিষ্কৃত না হওয়াতে, এ সম্পর্কে পরীক্ষণ সম্ভব না হওয়াতে, এরকম মনোভাব অস্বাভাবিক নয়। তারপরও অনেক বিজ্ঞানী মনে করছেন কম্পিউটার বা রোবটকে এমন উচ্চ স্তরে নেয়া ভবিষ্যতে সম্ভব হবে যে তার চিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ দেখে আমাদের পক্ষে এমন কথা বলার উপায়ই থাকবেনা যে তার চেতনা নাই।

সেই সম্ভাবনার কথা যদি আপাতত নাও ভাবি, চেতনার বিষয়টিকে দুরূহ সমস্যা বলে মেনে নিয়েও আমাদের চিন্তার বাদবাকি সব কিছু ব্যাখ্যার জন্য এটি তথ্য প্রসেসিং হিসাবে গণ্য হতে পারে। আর আধুনিক বিজ্ঞান মোটামুটি সেভাবেই একে দেখে। এভাবে দেখাটিকে বলা যায় চিন্তার কম্পিউটেশনাল থিওরি। এভাবে চিন্তার একটি নির্দিষ্ট রূপ আমরা পাচ্ছি– যাকে আর অশরীরী ধরা ছোঁয়ার বাইরে রহস্যাবৃত কোন কিছু মনে করতে হয়না। বরং তথ্য প্রসেসিং হিসাবে এর ব্যাখ্যায় সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব দেয়া যায়। স্পষ্ট বস্তুনিষ্ঠ পরীক্ষণের মাধ্যমে এসব তত্ত্ব প্রমাণ বা বাতিল করা যায়। এতে চিন্তার পুরো বিষয়টি সত্যিকার ভাবে বিজ্ঞানের আওতায় আসতে পারে। শিক্ষণ, স্মৃতি ইত্যাদির উন্নয়ন, কিংবা চিকিৎসার মত বাস্তব প্রয়োগে, এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মত ভবিষ্যৎমুখি সম্ভাবনাগুলোর বিকাশেও এই জ্ঞান খুবই ফলপ্রসূ হচ্ছে এবং হবে।

মস্তিষ্ক ঃ চিন্তা-চেতনার আধার

মস্তিষ্কের বিবর্তন

চিন্তার আধারটি যখন মস্তিষ্ক, তাই চিন্তার আলোচনা করতে হলে মস্তিষ্কের গঠনটি একটু বিস্তারিত জানতে হবে। আমাদের মস্তিষ্ক আমরা পেয়েছি বিবর্তনের ধারায়। বিবর্তনে আমাদের পূর্বসূরিদের অভিযাত্রা বুদ্ধির পথেই হয়েছিল বলে, ক্রমে ক্রমে তারা বৃহত্তর ও জটিলতর মস্তিষ্কের অধিকারী হয়েছে। আমাদের প্রজাতির মানুষ অর্থাৎ হোমো সেপিয়েন্সে এসে সেটি সর্বাধিক উৎকর্ষ লাভ করেছে। সাধারণ ভাবে তাই মস্তিষ্কের কাজের অর্থাৎ চিন্তার ক্ষেত্রেও একথা বলা যায়। বিবর্তনে মানুষের কাছাকাছি বর্তমান অনেক প্রাণি, বিশেষ করে প্রাইমেটদের মধ্যে (লেমুর, বানর, এইপ) তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট বড় ও উন্নত মস্তিষ্ক রয়েছে। তাই তাদের আচরণে ও শারীরবৃত্তে চিন্তার অনেকগুলো ছাপ দেখা যায়। কিন্তু মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার শুধু তাদের মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। প্রাণি জগতে এটি অনেক বিস্তৃত। জীবতাত্ত্বিক ভাবে আমাদের থেকে অনেক দূরের কিছু কিছু প্রাণিরও মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের ভাল বিকাশ লক্ষ্য করা যায়- যেমন অক্টোপাসের বুদ্ধির এমন সব পরিচয় পাওয়া যায় যা অবাক হবার মত। অথচ এই প্রাণিটি একটি অমেরুদণ্ডী প্রাণি, বিবর্তন বৃক্ষে আমাদের ধারার থেকে অনেক দূরের।

সুদূর অতীতে যখন বহুকোষী প্রাণির অভ্যুদয়ে তাদের কোষগুলো নানা বিশেষ বিশেষ কাজ করার জন্য বিশেষায়িত কোষকলায় রূপ পাচ্ছিল, তখন এক রকম কোষের বিশেষায়ন হয়েছে বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেবার উপযুক্ত হয়ে। সেগুলো হলো স্নায়ুকোষ। এই স্নায়ুকোষের ভিত্তিতে আদি প্রাণিদের মধ্যে স্নায়ুতন্ত্র গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তখনো তা ছিল শুধু সারা শরীরে বিস্তৃত হিসেবে, দেহের কোন একটি অংশে কেন্দ্রীভূত হয়নি মস্তিষ্কের মত। এর পর কোন কোন প্রাণি ধারায় কেন্দ্রীয় স্নায়ু সিষ্টেম গড়ে উঠেছিল– প্রথমে মস্তিষ্ক-সদৃশ ব্যবস্থা ও পরে মস্তিষ্ক হিসাবে। এখনো প্রাণি জগতে মস্তিষ্কবিহীন বহু প্রাণি রয়ে গেছে- যেমন তারা মাছ। আজকের বিভিন্ন প্রাণিদের দেখলে আমরা বিভিন্ন ধারায় মস্তিষ্কের ধারাবাহিক বিবর্তন দেখি এর আয়তনে, জটিলতার ও কার্যকারিতায়। কিন্তু মস্তিষ্কের উন্নয়নে বড় উল্লম্ফন হয়েছে স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে এসে। উষ্ণ রক্তের অধিকারী স্তন্যপায়ীদের এদিক থেকে বড় সুবিধা ছিল।

দেহ সব সময় নিজ উত্তাপ বজায় রাখতে পারে বলে মস্তিষ্কে স্নায়ুকোষ একই উত্তেজনায় সব সময় একই ভাবে সাড়া দিতে পেরেছে। এর ফলে মস্তিষ্কের স্থিতিশীল কাজ সম্ভব হয়েছে, বিকাশও সম্ভব হয়েছে। অবশ্য এই সুবিধাটি পাখিদের ক্ষেত্রেও রয়েছে। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে একটি গোষ্ঠি প্রাইমেটে এসে বুদ্ধির পথে অভিযাত্রায় সে বিকাশ অনেক দ্রুততর হয়েছে, মস্তিষ্ক ক্রমান্বয়ে কয়েক গুণ করে বড় হয়েছে, জটিলতরও হয়েছে। বানরের মধ্যে অন্য স্তন্যপায়ীদের তুলনায় কয়েক গুণ, এইপের মধ্যে বানরের তুলনায় আবার কয়েক গুণ, আমাদের পূর্বসূরি মানব-সদৃশ প্রজাতিদের মধ্যে ধাপে ধাপে কয়েক গুণ, এবং সবশেষে আমরা হোমো সেপিয়েন্সের মধ্যে আরো কয়েক গুণ বড় ও জটিল হয়েছে মস্তিষ্ক। এ ভাবে আমাদের মস্তিষ্কের আয়তন গড়পড়তা পূর্ণ বয়স্কের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে গেছে ১৩৫০ কিউবিক সেন্টিমিটারে (সিসি) যা নিকটতম এইপদের তুলনায়ও অনেক বড়। এর ওজন দাঁড়ায় ১৪০০ গ্রামের মত। কিন্তু এটি ঠিক যে আমাদের মস্তিষ্কের যে মৌলিক গঠন-প্ল্যান তা কিন্তু সব স্তন্যপায়ীদের মস্তিষ্কের সাধারণ গঠন-প্ল্যানেরই অনুরূপ। অনেক মৌলিক ক্ষেত্রে যে কোন স্তন্যপায়ী মস্তিষ্কের সাধারণ বর্ণনা, আমাদের মস্তিষ্কের বর্ণনার সঙ্গে সুন্দর মিলে যায়।

মানুষের মস্তিষ্কের গড়নঃ কোর্টেক্স অংশ

সব স্তন্যপায়ীদের মস্তিষ্কই বাম ও ডান এই দুটি অর্ধগোলকে ভাগ করা থাকে। আর প্রত্যেক অর্ধগোলকের মধ্যে একটু আলাদাকরে ফোলা স্পষ্ট চারটি পিণ্ড

মস্তিষ্কের দুই গোলার্ধ উপরিতলে কোর্টেক্স দেখা যাচ্ছে

(লোব) আকৃতির অংশকে চিহ্নিত করা যায় সম্মুখ (ফ্রন্টাল), পশ্চাত (অক্ষিপেটাল), পার্শ্ব (টেম্পোরাল) ও উর্দ্ধ-কিনারার (পেরিয়েটাল)। মানুষের মস্তিষ্কেও তাই দেখা যায়। চিন্তা চেতনার উচ্চতর কাজগুলোর দিক থেকে মস্তিষ্কের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে চারটি পিণ্ড জুড়ে কোঁকড়ানো উপরিভাগ যাকে বলা হয় কোর্টেক্স। আখরোটের ভাঁজের মত অনেক ভাঁজের

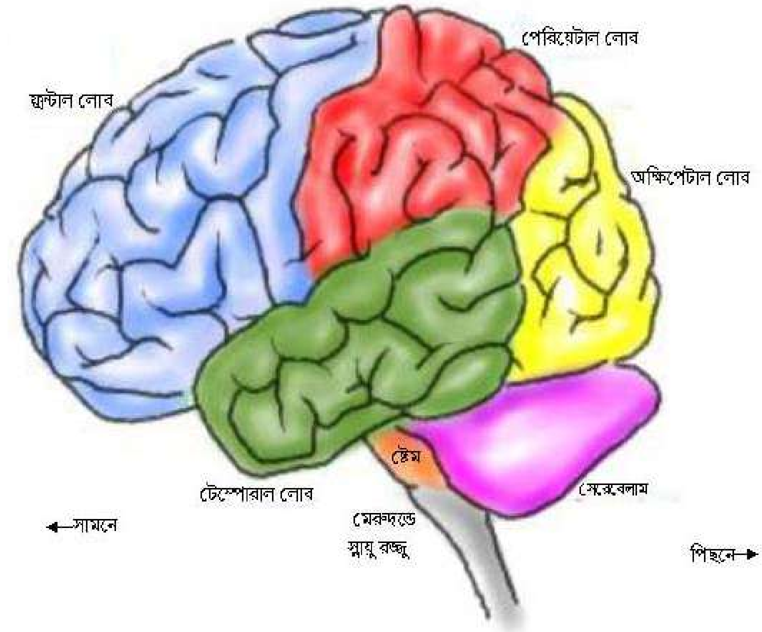

মস্তিষ্কের নানা এলাকা

কোঁকড়ানো এই অংশটিকেই খুলির ঠিক তলায় পাওয়া যায়। মাত্র ৪/৫ মিলিমিটার পুরু এই অংশের আয়তন পুরো মস্তিষ্কের তুলনায় খুব কম, কমলালেবুর তুলনায় তার ছিলকার যে আয়তন তার চেয়েও অনেক কম অংশ এটি মস্তিষ্কের। অথচ এটিই আমাদের পুরো আলোচনায় বেশির ভাগ জুড়ে থাকবে। মানব মস্তিষ্কের কোর্টেক্সে ঐ চারটি পিণ্ড আলাদা করে দেখাটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হচ্ছে মোটের উপর এদের প্রত্যেকটির এক এক রকম কাজের বিভাজন রয়েছে। সম্মুখ-পিণ্ডটিতে শরীরের নানা অঙ্গের নড়াচড়ার নিয়ন্ত্রণটি থাকে যাকে বলা হয় মোটর মেকানিজমের নিয়ন্ত্রণ। তাছাড়া আবেগের অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ, উচ্চতর সৃজনশীল কাজের সূক্ষ্ম বিবেচনা-এগুলোও সম্মুখ-পিণ্ডের কাজ। পশ্চাত-পিণ্ডটিতে ঘটে দৃষ্টি শক্তির মূল বিশ্লেষণ। মজার ব্যাপার হলো চোখ সামনে হলেও তার গৃহীত দৃষ্টি

অনুভূতিগুলোর প্রক্রিয়াকরণ হয় মস্তিষ্কের এই পেছনের অংশে। পার্শ্ব-পিণ্ডটিতে ভাষার অধিষ্ঠান– ভাষার অনুধাবন (ভেরনিক এলাকা), বাচন (ব্রোকা এলাকা) ইত্যাদি এরই নানা অংশে ঘটে থাকে। উর্দ্ধ কিনারার পিণ্ডটি ব্যবহৃত হয় সাধারণত নানা ইন্দ্রিয় থেকে আসা অনুভূতিগুলোর একত্রীকরণের কাজে।

সব মিলে কোর্টেক্স হচ্ছে মস্তিষ্কের হেডকোয়ার্টার। উচ্চতর সব নির্ধারণ এখানে হয়। মানুষের মস্তিষ্কের জন্য যা সত্য তা অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু সত্য– যেমন সম্মুখ পিণ্ডের কাজ মোটর মেকানিজম এবং কিছুটা আবেগ নিয়ন্ত্রণ, পশ্চাত পিণ্ডের দৃষ্টি বিশ্লেষণ ইত্যাদি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য প্রাণিতে এরা একই কাজ না করলেও তুলনীয় কিছু কাজ করে, যেমন মানুষের পার্শ্ব-পিণ্ড যেখানে ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাইমেটে তা হাতের ভঙ্গি করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তবে উচ্চতর চিন্তা, অনুধাবন, সৃজনশীলতা এসব কার্যক্রমের ছাপ শুধু মানুষের কোর্টেক্সেই খুঁজে পাওয়া যায়।

তুলনামূলক ভাবে পাতলা কোর্টেক্স মস্তিষ্কের বাকি অংশকে ঢেকে রাখছে, কিন্তু কোঁকড়ানো আকৃতির কারণে এর আসল তলটি মস্তিষ্কের উপরিতলের আয়তনের চেয়ে অনেক বড়। যদি এই ভাঁজগুলো ইস্তারি করে সমান করে দিয়ে মানুষের পুরো কোর্টেক্সটাকে টেবিলের উপর বিছিয়ে দেয়া যেত, তা হলে এর তলের আয়তন হতো ২৫০০ বর্গ সেন্টিমিটার- যা A4 সাইজের চারটি কাগজের শীটের সম্মিলিত আয়তনের প্রায় সমান। শিম্পাঞ্জির কোর্টেক্স নিয়ে

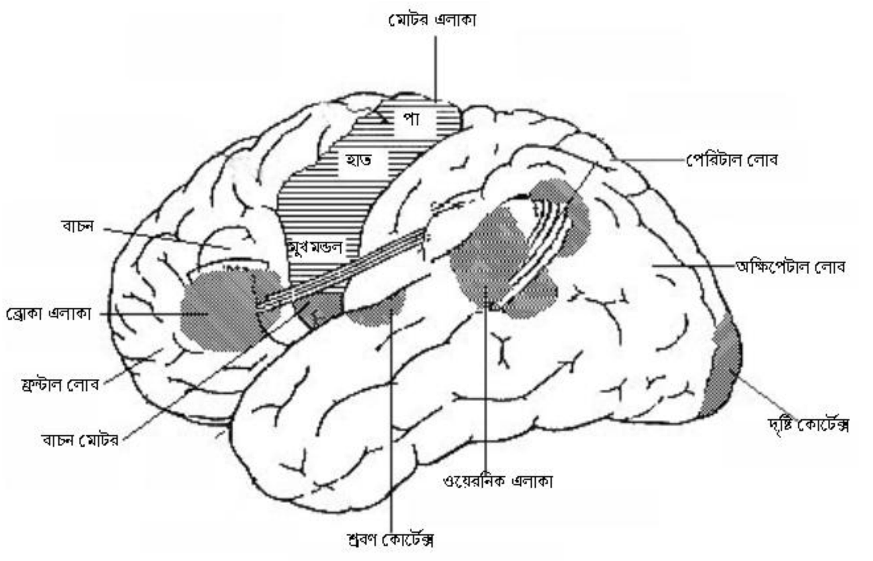

বিভিন্ন কাজের দায়িত্বে মস্তিষ্কের নানা অংশ

এই একই কাজ করা হলে তা দাড়াবে চারটির বদলে মাত্র একটি কাগজের শীটের সমান। বানরের ক্ষেত্রে এটি হবে একটি পোষ্ট-কার্ডের সমান, আর ইঁদুরের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ সাইজের পোষ্টাল ষ্ট্যাম্পের সমান। এর থেকেই কিছুটা বুঝা যাচ্ছে মানুষের কোর্টেক্সের তুলনামূলক বড় আকৃতি এবং ফলশ্রুতিতে উচ্চতর কার্যকারিতা।

আমরা যাকে ঘিলু বা গ্রে-ম্যাটার বলি তা আসলে মস্তিষ্কের উপরি-অংশ ঐ কোর্টেস্ক। এখানে রক্ত সঞ্চালনের কারণে জীবন্ত কোর্টেক্স ঠিক গ্রে বা ছাই রঙের নয়, বরং কিছুটা গোলাপি আভার। কোর্টেক্স পাতলা হলে কি হবে এই পাতলা পুরুত্বের মধ্যেই এর রয়েছে সমান্তরাল ছয়টি স্তর। বিভিন্ন স্তরে রয়েছে বিভিন্ন রকম স্নায়ুকোষ ও তার আনুসঙ্গিক অন্য বস্তু। পুরো কোর্টেক্সের ঠিক তলায় বিস্তৃত থাকে স্নায়ুকোষগুলোর লম্বা যোগাযোগের অংশগুলো যাকে বলা হয় এক্সন বা স্নায়ুতন্তু। এদের একটি বৈশিষ্ট হলো স্নায়ুর সিগন্যাল বহনের সুবিধার জন্য এদের উপরিভাগ মায়লিন নামক সাদা অন্তরক বস্তুতে আবৃত থাকে অনেকটা বৈদ্যুতিক তার যেরকম রাবারের অন্তরকে দিয়ে ঢাকা থাকে সেরকম। এই সাদা মায়লিনের কারণে কোর্টেক্সের ঠিক তলার মস্তিষ্কের এই অংশটি দেখতে সাদা। তাই একে বলা হয় হোয়াইট ম্যাটার।

কোর্টেক্সের তলায় অন্যান্য অংশ

কোর্টেক্স ছাড়া মস্তিষ্কের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে। কোর্টক্সের তলা থেকে আসা স্নায়ুতন্তু গুচ্ছ হয়ে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে নেমে এসে বাণ্ডিলের রূপ নেয়। কোর্পাস কলোসাম নামের এরকম বড় বাণ্ডিল মস্তিষ্কের দুই অর্ধগোলকের মধ্যে স্নায়ু সংযোগের কাজ করে। মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে বাঁকানো একটি ছোট অংশ হলো হিপোক্যাম্পাস– যা স্মৃতির ক্ষেত্রে কাজ করে। আর একটি ছোট অংশ এমিগডালা, গ্রীক ভাষায় যার নামের অর্থ বাদাম, দেখতেও অনেকটা সে রকম। এর সঙ্গে আবেগ সৃষ্টির সম্পর্ক রয়েছে। মস্তিষ্কের পেছনে নিচের অংশটি একটি ডাঁটার মত নেমে এসেছে যা হলো ব্রেইন ষ্টেম। ষ্টেমের ঠিক উপরে ছোট সেরেবেলাম ল্যাটিন ভাষায় যার আক্ষরিক অর্থ ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক। একেবারে আদিতে সরীসৃপ ইত্যাদিতে শুধু এটিই মস্তিষ্কের কাজ করতো তাই এই নাম। এটি সাধারণত শরীরের নড়াচড়ার নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে জড়িত- আদিতে প্রাণিকে শুধু নড়াচড়ার নিয়ন্ত্রণ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হতো। ষ্টেমের নিচের দিকে ব্যাসাল গ্যাংলিয়া নামক অংশও নড়াচড়ার সঙ্গে জড়িত।

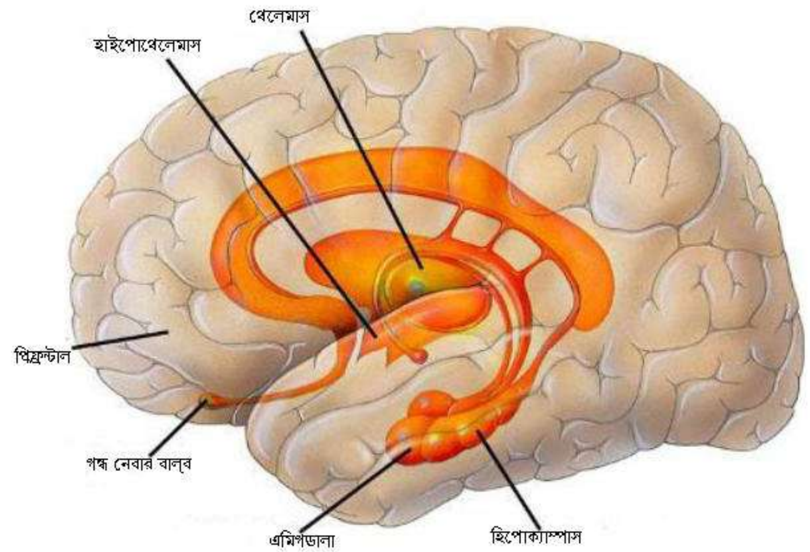

মস্তিষ্ক: কোর্টেক্স বহির্ভূত কিছু অংশ

মস্তিষ্কের দুই অর্ধগোলকের মাঝখানে উভয় পাশে রয়েছে থ্যালেমাস। সব ইন্দ্রিয় থেকে অনুভূতির যে সিগন্যাল আসে তা সবই থ্যালেমাস হয়ে কোর্টেস্ক অর্থাৎ হেডকোয়ার্টারে যায়। আবার কোর্টেক্স থেকে সে সব নির্দেশের সিগন্যাল আসে তাও থ্যালেমাস হয়ে যায়। তাই এই থ্যালেমাসকে একটি রীলে ষ্টেশন হিসেবে দেখা যায়। দুই অর্ধগোলকের নিচে তলার দিকে যাকে আরেকটি অংশ হাইপোথ্যালেমাস। এটি পিচিউটারি গ্রন্থিকে নিয়ন্ত্রণ করে। পিচিউটারি গ্রন্থি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমোন নিঃসরণকারী গ্রন্থি। আমাদের শরীরের অনেক কিছুর নিয়ামক যে নানা ‘হরমোন তা নানা গ্রন্থি থেকে নির্গত হলেও পিচিউটারি গ্রন্থির একটি বড় প্রভাব থাকে এ সবের উপর।

মস্তিষ্কে স্নায়ুকোষ

স্নায়ুকোষ মস্তিষ্কের শতকরা মাত্র দশ ভাগ জায়গা দখল করে থাকে। কিন্তু এরাই হলো মস্তিষ্কের সব কাজের আসল কর্মী। নিউরোন নামে পরিচিত এই বিশেষ ধরনের কোষের কাজের মাধ্যমেই চিন্তার সব কিছু সম্পাদিত হয়। এদের বাদ দিলে মস্তিষ্কের বাকি নব্বই ভাগ কোষের ভূমিকা নেহাৎ সহায়কের। এদের সম্মিলিতভাবে বলা হয় গ্লিয়া যার অর্থ গ্ল্যু অর্থাৎ আঠা। আগে মনে করা

হতো যে স্নায়ুকোষ – গুলোর এক ধরনের ধারক হিসাবে তাদের একত্রে রাখাটাই গ্লিয়ার কাজ। এখন অবশ্য আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু সহায়ক কাজ তাদের রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।অন্তরক হিসাবে যে আবরণ দিয়ে এক্সন ঢাকা থাকে সেই মায়লিনও গ্লিয়ার অংশ।

আমাদের মস্তিষ্কের নিউরোনের সংখ্যা ১০ হাজার কোটির মত। এ কোষের বৈশিষ্ট হলো এর প্রত্যেকটি বিশেষ ব্যবস্থায় অন্য আরো ১০ হাজার নিউরোনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। এর অর্থ হলো মস্তিষ্কে থাকে পরস্পর সংযুক্ত অসংখ্য নিউরোনের জটিল জাল। এই পরস্পর সংযোগগুলো চিন্তার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে– সেটি আমরা দেখবো।

প্রত্যেক নিউরোনের তিনটি অংশ থাকে– কোষ দেহ, সিগন্যাল গ্রহণের জন্য ডেনড্রাইট, এবং সিগন্যাল প্রেরণের জন্য এক্সন। কোষ দেহটাই হলো নিউরোনের মূল অংশ। এর থেকে অনেকগুলো সরু স্নায়ুতন্তু বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে ঝাঁকড়া বৃক্ষের আকার ধারণ করে যাকে বলা হয় ডেনড্রাইট। এদের মাধ্যমেই অন্যান্য বহু নিউরোন থেকে সিগন্যাল কোষ দেহে আসে। কোষ দেহের এক প্রান্ত দন্ডের আকৃতি নিয়ে অনেক লম্বা হয়– সেটি এর এক্সন। গ্রীক ভাষায় এক্সন মানেই হলো মূল দণ্ড। এই এক্সন দিয়েই সিগন্যাল

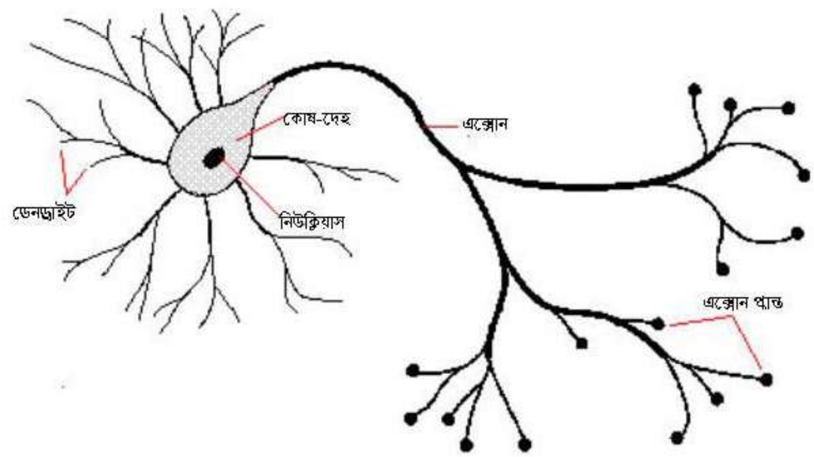

নিউরোন

কোষ দেহ থেকে অন্য নিউরোনে বা অন্যত্র যায়। কোর্টেক্সে এক্সনের শাখা থাকেনা, কোর্টেক্সের বাইরে গিয়ে শাখা বিস্তার ঘটে।

এভাবে শেষ প্রান্তে গিয়ে এক্সন কিছু সূক্ষ্ম শাখায় বিভক্ত হয়। প্রত্যেকটি শাখার প্রান্ত মোটা গুটির মত হয়ে অন্য একটি নিউরোনের কোষ দেহ বা ডেনড্রাইটের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করে, যার মাধ্যমে সেটিতে সিগন্যাল প্রেরণ সম্ভব হয়। এই সংযোগটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ সিগন্যাল চলাচলের ও তার মাধ্যমে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের অনেক কিছুই এই সংযোগের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। একে বলা হয় সিনাপ্‌স গ্রীক ভাষায় যার মানেই হলো সংযোগ। সিনাপ্‌সে এক্সন শাখার গুটি এবং যার সঙ্গে এটি সংযোগ করছে এই উভয়ের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম একটু ব্যবধান সৃষ্টি হয় যা এক মিলিমিটারের দুই কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। সিগন্যাল প্রবাহের সময় সিনাপ্‌সের ঐ গুটি থেকে বিভিন্ন ধরনের ক্যামিকাল্‌স ঐ ব্যবধানের জায়গায় নিঃসরিত হয়, যেগুলোকে বলা হয় নিউরোট্রান্সমিটার (স্নায়বিক প্রেরণ বস্তু)। এই ক্যামিকালসের মাধ্যমেই এই পর্যায়ে সিগন্যাল নিউরোন থেকে নিউরোনে সঞ্চারিত হয়। বিশেষ বিশেষ নিউরোট্রান্সমিটার আমাদের চিন্তা প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে এর আবেগের প্রক্রিয়ায়, গুরুত্বপূর্ণ ভাবে অংশ গ্রহণ করে।

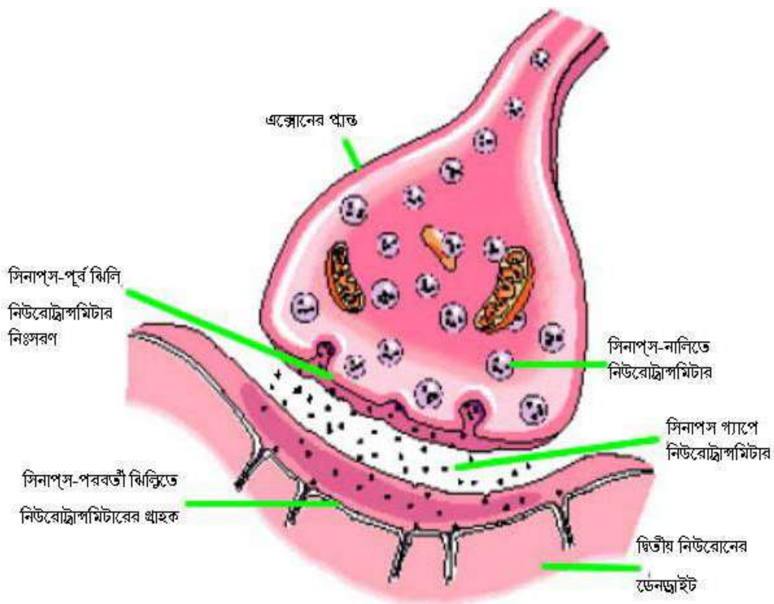

সিনাপসের গঠন

স্নায়ু সিগন্যালকে এক সময় বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক সিগন্যাল মনে করলেও পরে বুঝা গেছে যে এতে বৈদ্যুতিক অংশটি মুখ্য নয়, বরং রাসায়নিক প্রক্রিয়াটিই মুখ্য। সিনাপ্‌সের মাধ্যমে এক্সন থেকে যে সিগন্যাল অন্য নিউরোনে বা অন্য কোষে সঞ্চারিত হয় তার প্রকৃতিটি বুঝা গেছে ল্যাবোরেটরিতে পরীক্ষণ থেকে। ল্যাবোরেটরীতে এরকম নিউরোন প্রান্ত পেশীর কোষের সঙ্গে সংযুক্ত করা

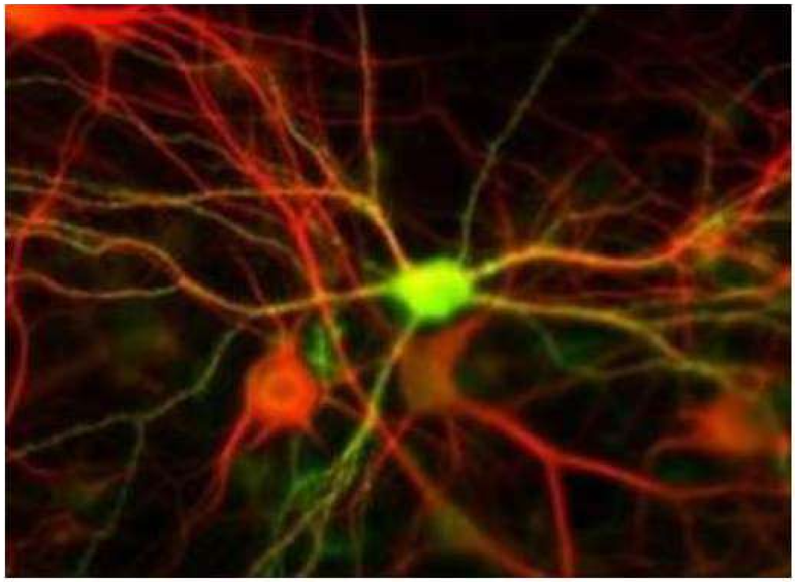

নিউরোন ফায়ারিং

হয়েছে। এক্সনের মাধ্যমে স্নায়ু সিগন্যাল আসলে পেশী সংকুচিত হয় এবং একই সঙ্গে পেশীতে এসিটোকোলাইন নামক ক্যামিকালের মাত্রা বেড়ে যায়। এভাবে বুঝা গেছে যে সিগন্যালটি এসেছে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় নয়। কোন নিউরোন যখন সিগন্যাল গ্রহণ করে তখন এটি সেই সিগন্যাল অনুযায়ী তার সাড়া দেয়। গৃহীত সিগন্যাল কিন্তু একটি সংযোগ থেকে আসছেনা, এর ডেনড্রাইটের সঙ্গে সংযুক্ত হাজার হাজার সিনাপ্‌সের অনেকগুলো দিয়ে এ সিগন্যাল আসতে পারে। সেগুলোর সম্মিলিত আগমনটিই ঠিক করে দেবে কী ধরনের সাড়া এটি দেবে, যা আবার এর এক্সনের মধ্য দিয়ে অন্য নিউরোনে যাবে। এই সাড়াটি হতে পারে একটি উচ্চকিত সিগন্যাল ইমপাল্‌সের বা স্ফুরনের আকারে। তখন একে বলা হবে নিউরোনটি ফায়ার করেছে। আবার অন্য সময় হয়তো কোন সাড়াই এটি দেবেনা, সিগন্যাল

অবদমিত হবে। সব কিছু নির্ভর করবে আগত সম্মিলিত সিগন্যালগুলোর উপর। নিউরোন ফায়ার করা বা অবদমিত হওয়া আবার বিশেষ বিশেষ নিউরোট্রান্সমিটার এর সিনাপ্স থেকে নির্গত হওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত।

মস্তিষ্কে নিউরোন গুচ্ছে আতশবাজি

সিগন্যাল আসার ফলে তার সাড়া হিসাবে নিউরোনে যে ইমপাল্স তৈরি হয় তার প্রকৃতিটি দেখা যাক। নিউরোনের দেয়াল হিসাবে যে ঝিল্লি তার ভেতর দিয়ে এতে সোডিয়াম ও পটাশিয়ামের আয়ন অর্থাৎ চার্জযুক্ত পরমাণু আসা যাওয়া করতে পারে। এর কারণে নিষ্ক্রিয় অবস্থাতেও এই ঝিল্লির বাইরের তল আর ভেতরের তলের মাঝে একটি ছোট ভোল্টেজ সব সময় থাকে সাধারণত -৭০ মিলিভোল্ট (নেগেটিভ)। কিন্তু যখন এতে সিগন্যাল আসে এবং সেই

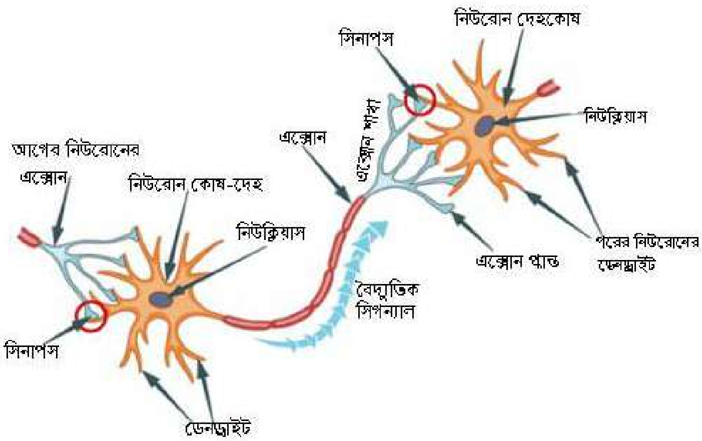

নিউরোনে-নিউরোনে সংযোগ

সিগন্যাল একটি বিশেষ মাত্রার উর্দ্ধে আসে তখন এর ফলে সোডিয়াম ও পটাশিয়াম আয়নের ভারসাম্য বড় রকমে বদলে যায়। তখন বাইরের এবং ভেতরের তলের মধ্যে ভোল্টেজ সম্পূর্ণ উল্টে গিয়ে পজিটিভ দিকেই +৪০ মিলিভোল্টে গিয়ে দাঁড়ায়। সিগন্যালের ফলে নিউরোনের ইমপাল্স এভাবেই দেখা দেয় এবং তাকে বলা হয় এ্যাকশন পোটেনশিয়াল। এটি একই প্রক্রিয়ায় সংলগ্ন পর পর স্নায়ুকোষের তন্তুতেও একই ভাবে এ্যাকশন পোটেনশিয়াল সৃষ্টি করে এবং সিগন্যাল এগিয়ে চলে। কিন্তু এর বিদ্যুৎ ভোল্টেজটি স্থানীয় প্রকৃতির। তার প্রভাবটি সামনের দিকে পরবর্তী কোষে যায় বটে, কিন্তু সেই

প্রবাহটি বৈদ্যুতিক নয়, বরং রাসায়নিক। সিগন্যালটি আসলে এগিয়ে যাচ্ছে ঐ রাসায়নিক নিঃসরণের মাধ্যমে, যার গতি সেকেণ্ডে মাত্র ১০ থেকে ১০০ মিটার, বিদ্যুৎ প্রবাহের তুলনায় যা একেবারেই ধীর।

নিউরোন যে সিগন্যালগুলো পায় তার সম্মিলিত ফল হতে পারে তার সাড়াকে অবদমিত করা, অথবা তার সাড়াকে উচ্চকিত করে তাকে ফায়ার করানো। প্রথমটি কাজ করে নিবারকের, দ্বিতীয়টি উত্তেজকের। মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেক নিউরোন প্রায় ১০ হাজার নিউরোনের সঙ্গে যুক্ত থেকে জটিল বর্তনীজাল সৃষ্টি করে আছে- বিশেষ করে কোর্টেক্সে। আগত সিগন্যালের কারণে এই জালের কোন কোন অংশে ফায়ার করা নিউরোন থাকবে, অন্যান্য অংশে থাকবেনা। ফলে ঐ ফায়ার করা নিউরোনগুলোর ফুলকি যদি আমরা দেখার ব্যবস্থা করতে পারি তা হলে সেটি দেখবো একটি আতশবাজির প্যাটার্নের মত। আসলে বর্তমানে উন্নত ইমেজিং পদ্ধতিতে আমরা ঠিক তাই দেখতে পারি। সিগন্যাল বদলের সঙ্গে সঙ্গে এই প্যাটার্নও বদলাতে থাকবে- আতশবাজির মতই। চিন্তার মধ্যে যে নানা কিছু স্মৃতি, বুদ্ধি, আবেগ, চেতনা তার অনেক কিছুই এই প্যাটার্নের সঙ্গে সম্পর্কিত। বলতে গেলে চিন্তা যে তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ সেই তথ্যের প্রতিনিধিত্বকারী চিহ্নগুলো এই প্যাটার্নের মাধ্যমে রূপ পাচ্ছে, এবং তারই কাজের দ্বারা প্রক্রিয়াকৃত হচ্ছে। বারকোডে তথ্য যে ভাবে নানা পুরুত্বের রেখার মত থাকে এও অনেকটা সে রকম। এক্ষেত্রে অবশ্য এরকম কোন কোন আতশবাজি তার স্নায়ু বর্তনীকেই স্থায়ীভাবে পরিবর্তন করে ফেলে যার ফলে পরবর্তী সময়ের সিগন্যাল অন্যরকম অনুকূল বা প্রতিকূল বর্তনীর পরিবেশ পায়। এটি মস্তিষ্কের একটি চমকপ্রদ বৈশিষ্ট- তার প্লাষ্টিক বা নমনীয় হবার কারণে।

নিউরোট্রান্সমিটারের কাজ

নিউরোট্রান্সমিটার নামক ক্যামিকালগুলো মস্তিষ্কে এমনভাবে রয়েছে যেন সব স্নায়ু বর্তনী এই ক্যামিকালগুলোতে ভেজানো রয়েছে। নিজেদের প্রকৃতি অনুযায়ী এই নিউরোট্রান্সমিটার এক স্নায়ু কোষ থেকে অন্য কোষে সিগন্যাল যেতে দেয়, এবং যাওয়ার পথে এদেরকে বাড়ায়-কমায়ও।

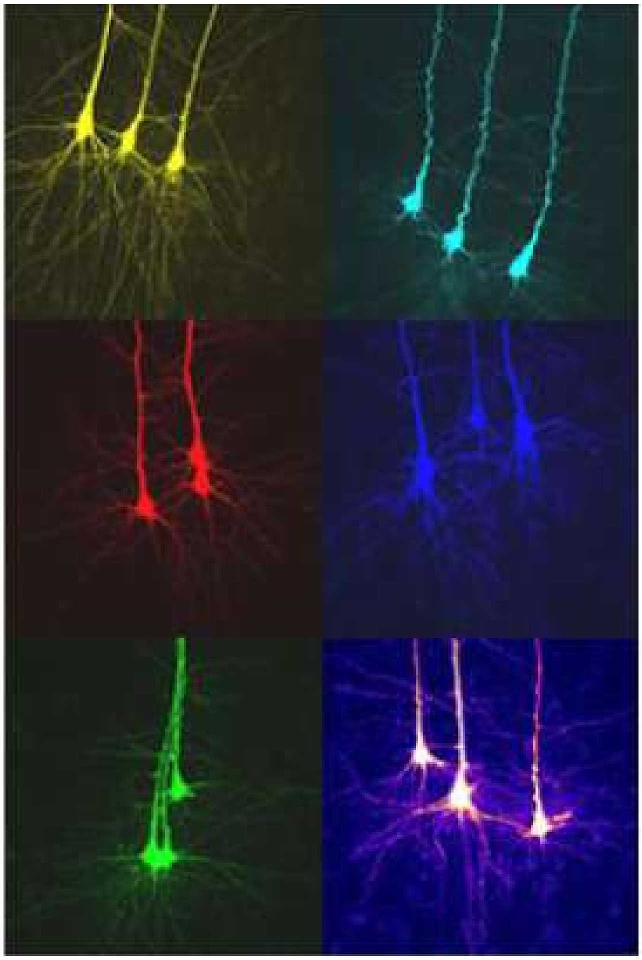

ডেনড্রাইট ঝোপে নিউরোন আতশবাজি

মানুষের পঞ্চাশটির মত বিভিন্ন রকম নিউরোট্রান্সমিটার রয়েছে প্রাপ্ত ইমপাল্‌স অনুযায়ী এগুলোর কোন কোনটি মুখ্য হয়ে উঠে। এদের মধ্যে কয়েকটি আমাদের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ আমাদের চিন্তার পরিস্থিতি সৃষ্টিতে তাদের কাজ রয়েছে। এদের কোন কোনটি ওষুধ হিসেবেও ব্যবহৃত হয় আবেগ, মুড ইত্যাদি বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসাবে। কয়েকটি প্রধান নিউরোট্রান্সমিটারে মধ্যে আছে গ্লুটামাইট যা প্রধানত উত্তেজক; GABA যা প্রধানত নিবারক– ফায়ারিং এর অনিয়ম দমন করে; ডোপামাইন যা সুখানুভূতি সৃষ্টি করে, আবার এলকোহল আসক্তি, ড্রাগ আসক্তি ইত্যাদির মূলেও কাজ

করে; সেরাটনিন যা সতর্ক মনোভঙ্গি থেকে বিষণ্নতা পর্যন্ত নানা মুড নিয়ন্ত্রণ করে; এনডোরফিন যা ব্যথা নিয়ন্ত্রণ করে; ইত্যাদি।

বিশেষায়িত নিউরোন

জন্মের আগে থেকেই মাতৃগর্ভে সন্তানের মস্তিষ্কের নানা অংশে নানা বিশেষায়িত পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। বিশেষায়নটি কিছুটা হয় নিউরোনের বিভিন্নতার কারণে যা বিশেষ নিউরোনকে বিশেষ কাজের বেশি উপযুক্ত করে। তবে এতে বর্তনীর সংযোগগুলোর বিভিন্নতাও রয়েছে। তাছাড়া খুব স্পষ্ট পার্থক্য আসে নিউরোনের স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে। এসব বিভিন্নতার ফলে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ এক এক ধরনের দায়িত্ব পালনে বেশি উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠে। তবে এর মানে এই নয় যে একবার একটি কাজে বিশেষায়িত হয়ে গেলে এটি আবার প্রয়োজনে বদলে গিয়ে অন্য কাজের দায়িত্ব নিতে পারেনা। যেমন রোগ বা দুর্ঘটনায় মস্তিষ্কের কোন অংশ নষ্ট হলে তার কাজ অন্য অংশ নিতে পারে। আবার নানা কারণে কোন অংশের স্বাভাবিক ব্যবহার হতে না পারলে তাও অন্য কাজের জন্য উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে। এসব ক্ষমতা নিউরনের ও মস্তিষ্কের চমকপ্রদ নমনীয়তার পরিচয় দেয়। অতি সম্প্রতি দেখা গেছে যে চোখের থেকে আসা স্নায়ু সিগন্যাল দর্শন কোর্টেক্সের দিকে না পাঠিয়ে শ্রবণ কোর্টেক্সে পাঠালে সেখানেই দর্শন বোধের ক্ষমতা জন্মাতে পারে। আসলে নমনীয়তা মস্তিষ্কের আরো অনেক ক্ষমতার সুযোগ করে দেয়। যেমন এরকম পরিবর্তন স্থায়ী স্মৃতির সুযোগ করে দিতে পারে।

শৈশবে মস্তিষ্কের গড়ে উঠা

মানব শিশু বেশ অপরিণত মস্তিষ্ক নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়। জন্ম ও পূর্ণ বয়স্ক হবার মাঝখানের সময়ে অর্থাৎ শৈশবে ও কৈশোরে মানুষের মস্তিষ্ক প্রায় চারগুণ বড় হয়। এই বিষয়টি অনেক দিন ধরে জানা থাকলেও মস্তিষ্কের নানা অংশের এভাবে গড়ে উঠার বিস্তারিত তথ্য আমরা ভাল বুঝতে পারছি শুধু গত কয়েক দশক ধরে। এ সময় উন্নত ইমেজিং পদ্ধতি সমূহের কল্যাণে আধুনিক গবেষণা পদ্ধতি অনেক নিঁখুত ভাবে এই বৃদ্ধি ও গঠনকে অনুসরণ করতে পেরেছে। দেখা যাচ্ছে কোর্টেক্সের এবং আরো বিশেষ করে সামনের কোর্টেক্সের বৃদ্ধি ঘটে খুবই ধীরে। মানব মস্তিষ্কে এই অংশগুলোই অন্যদের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে অধিক বড় ও কুশলী। আর এসবের অর্জন ঘটে শৈশবে ও কৈশোরে ধীরে ধীরে। এ জন্য মানুষের ক্ষেত্রে শৈশব ও কৈশোরের গুরুত্ব খুব বেশি। এ

সময় বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে ক্রিয়া বিক্রিয়া কীভাবে ঘটছে তার একটি প্রভাব মস্তিষ্কের এভাবে গড়ে উঠার উপর থাকে।

সাধারণভাবে বলতে হয় মস্তিষ্কের বৃদ্ধিতে নিউরোনের সংখ্যা বাড়েনা– বরং বাড়ে সিনাপ্‌স সমূহ ও ডেনড্রাইটের পরিমাণ, বাড়ে তন্তুর বাণ্ডিলগুলো ও এদের জটিলতা ও শাখা-প্রশাখা। তবে এগুলো ক্রমাগত একই হারে বাড়তে থাকেনা। জন্মের পর প্রথম ছয় মাসে কোর্টেক্সে এরা খুবই দ্রুত বাড়ে তারপর আর তেমন নয়, বরং পরে কিছু কিছু কমেও যেতে পারে। প্রায় দশ বছর বয়সের দিকে গিয়ে সবকিছু কিছুটা স্থিতি পায়। কোর্টেক্স বহির্ভূত অংশগুলোতেও সিনাপ্‌স ডেনড্রাইট ইত্যাদির জটিলতা বাড়ে যদিও কোর্টেক্সের মত এতটা নয়। এসব বৃদ্ধির ফলে শৈশবে ও বাল্যকালে চেতনাগত যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে।

গবেষণার উপায়গুলো

রোগীরাই ছিল গবেষণার বড় অবলম্বন

মস্তিষ্কের উপর সরাসরি গবেষণা অল্প কিছু দিন আগেও যথেষ্ট দুরূহ ছিল। শক্ত মাথার খুলিতে নিরাপদে ঢাকা মস্তিষ্ক অত্যন্ত নাজুক একটি দেহাংশ– এখানে কোন রকম হস্তক্ষেপ করা, অস্ত্রোপচার করা, এমনকি গবেষণার যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ একটি কাজ ছিল। কাজেই শুধু গবেষণার খাতিরে সুস্থ মানুষের মস্তিষ্কে সে সব করার উপায় ছিল না। কিন্তু মস্তিষ্কের গুরুতর অসুখে তার উপর অস্ত্রোপচার করার প্রচলন প্রাচীন গ্রীকদের আমলেই ছিল এবং আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার কালে এসে এটি অনেক উন্নতও হয়েছে। তাছাড়া মস্তিষ্কের অসুখে ভোগা রোগীর মৃত্যুর পর তাদের মস্তিষ্ক ব্যবচ্ছেদও অনেক ক্ষেত্রে করা হয়েছে। এসবের মাধ্যমে স্বাভাবিক মস্তিষ্কের সঙ্গে রোগাক্রান্ত মস্তিষ্কের নানা অংশ তুলনা করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে চিন্তার নানা কাজে এসব অংশের ভূমিকা সম্পর্কে জানাও সম্ভব হয়েছে। বলতে গেলে এটিই ছিল সরাসরি মানুষের মস্তিষ্কের উপর গবেষণার একমাত্র উপায়। শতাধিক বছর ধরে এভাবে মস্তিষ্কবিদরা লক্ষ্য করেছেন মস্তিষ্কের কোন অংশের ক্ষতি হলে চিন্তা-চেতনার স্বাভাবিক কার্যক্রমের কী ধরনের ব্যত্যয় ঘটে। এ সম্পর্কে বেশ কিছু তত্ত্ব এরকম গবেষণার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হাত পেরেছে।

রোগীদের উপর গবেষণার একটি পরিচিত উদাহরণ হলো স্মৃতিভ্রষ্টতায় ভোগা মানুষের উপর গবেষণা করে মস্তিষ্কে স্মৃতির প্রক্রিয়াগুলোকে বুঝার চেষ্টা। এ সম্পর্কে অতীতের জ্ঞানগুলো এভাবেই এসেছে। অনেকে গুরুতর ভাবে স্মৃতিভ্রষ্ট হয় মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশে বড় আঘাতের ফলে। কী ধরনের আঘাত মস্তিষ্কের কোথায় ক্ষতি করলে কী রকম স্মৃতি বিনষ্ট হয় তা লক্ষ্য করে স্মৃতির তত্ত্ব সম্পর্কে কিছু কিছু ধারণা সম্ভব হয়েছে। আরো বিখ্যাত তত্ত্ব এসেছে মস্তিষ্কের ভাষা অঞ্চল সম্পর্কে। মস্তিষ্কের একটি অংশকে বলা হয় ভেরনিক অঞ্চল– বাম অর্ধগোলকের পার্শ্ব-পিণ্ডের পেছনের দিকে। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানী ভেরনিক লক্ষ্য করেছিলেন এই অঞ্চলটি আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ হলে রোগী অন্যের কথা বুঝতে পারেনা, কেউ কিছু বল্‌লে তার অর্থ বুঝতে কষ্ট হয়। কিন্তু রোগী নিজে ঠিকই কথা বলতে পারে, যা বলতে চায় তাই স্বাভাবিক ভাবে বলতে পারে। এখান থেকেই ভেরনিক সিদ্ধান্তে এলেন মস্তিষ্কের এই অঞ্চলটিই ভাষা অনুধাবনের জন্য দায়ী, এটি এর অন্যতম ভাষা

অঞ্চল। অন্যদিকে ব্রোকা নামক আর একজন বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেছিলেন যে সব রোগীর মস্তিষ্কের বামে সম্মুখ-পিণ্ডের পেছনে নিচের একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয় তারা অন্যের কথা বুঝতে পারলেও নিজে বাকহীন হয়ে পড়ে, অথবা কথা বলতে কষ্ট হয়। সেই থেকে বুঝা গেলো যে ব্রোকা অঞ্চল নামে পরিচিত মস্তিষ্কের এই অঞ্চলটি বাচন ক্ষমতার জন্য দায়ী। এটি ভাল না থাকলে সুস্থ স্বরতন্ত্রী নিয়েও কথা বলা দুরূহ হয়। এও তাই মস্তিষ্কের আর একটি ভাষা অঞ্চল।

অন্য প্রাণির উপর পরীক্ষা-নিরিক্ষা

মস্তিষ্ক বা স্নায়ুতন্ত্র শুধু মানুষের নয়, অন্য অসংখ্য প্রাণিরও তা আছে। বহু দিন ধরে এসব প্রাণির উপর স্নায়ু সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরিক্ষা করে এক একটি স্নায়বিক কাজের বা সাড়ার মূল প্রক্রিয়াটি বুঝার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপর একই প্রক্রিয়া মানুষের ক্ষেত্রেও অন্তত মৌলিক দিকটিতে ঘটে তা ধরে নেয়া যায়, এবং মানুষের ক্ষেত্রে অবস্থাদৃষ্টে ধারণাটির সম্প্রসারণ ঘটানো সম্ভব হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবে মনে করা যায় যে যেই প্রাণির মস্তিষ্ক মানুষের মস্তিষ্কের যত কাছাকাছি হবে পরীক্ষাগুলো সেই প্রাণির ক্ষেত্রে করাটিই তত ভাল হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কথাটি ঠিক। যেমন দর্শন অনুভূতির, বুদ্ধিমত্তার, বা ভাষার মত যোগাযোগের, কিংবা সামাজিক অনুধাবন ইত্যাদির ক্ষেত্রে মানুষের সব চেয়ে কাছাকাছি প্রাণি অন্য প্রাইমেটদের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে অনেক কিছু জানা গেছে– যেমন বানর, শিম্পাঞ্জি বা গরিলার ক্ষেত্রে। এসব প্রাইমেটের মস্তিষ্ক মানব মস্তিষ্কের খুবই সদৃশ যদিও আকারে বেশ খানিকটা ছোট। আসলে অন্যান্য সব স্তন্যপায়ীর সঙ্গেও মানুষের মস্তিষ্কের গঠনের মৌলিক মিল রয়েছে যথেষ্ট। তাই ইঁদুর, গিনিপিগ ইত্যাদির উপরও প্রচুর পরীক্ষা নিরিক্ষা এক্ষেত্রে হয়ে থাকে, অতীতেও প্রচুর হয়েছে।

কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে অনেক সময় এগুলো ছাড়াও মানুষের থেকে একেবারেই ভিন্ন রকমের প্রাণি যাদের মস্তিষ্ক বা স্নায়ুতন্ত্র অত্যন্ত সরল প্রকৃতির, এমন কি অতি স্বল্প সংখ্যক স্নায়ু কোষ নিয়ে গঠিত সেগুলোও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার পাত্র হয়েছে। এদের ক্ষেত্রে সুবিধাটি হলো জটিলতা না থাকায় বিশেষ বিশেষ স্নায়ুর উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে। যেমন ১৯৫২ সালে হজকিন ও হাক্সলী নামে দুই বিজ্ঞানী একটি বিখ্যাত পরীক্ষার মাধ্যমে স্নায়ুর সিগন্যাল সাড়ার প্রকৃতি আবিষ্কার করেছিলেন, যেই সাড়াকে বলা হয় এ্যাকশন পোটেনশিয়াল। সে পরীক্ষাটি করা হয়েছিল

স্কুইডের উপর– অত্যন্ত সরল প্রকৃতির প্রাণি। স্নায়ুর এ্যাকশন পোটেনশিয়ালের মত এমন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়ের উদ্ঘাটন হয়েছে এই অতি সরল সোজা-সাপ্টা সাড়া দেবার প্রাণি থেকে। পরীক্ষাটি এর উপর করার কারণ হলো স্কুইডের স্নায়ুতন্তু অনেক মোটা– রীতিমত এক মিলিমিটারের মত পুরু। পরীক্ষাটি ছিল স্থূল প্রকৃতির, কারণ স্নায়ুতন্তুর সঙ্গে সরাসরি বৈদ্যুতিক পরিমাপের তার ইত্যাদির সংযোগ দেবার ব্যাপার ছিল। উন্নততর মস্তিষ্ক বিশিষ্ট প্রাণির ক্ষেত্রে স্নায়ুতন্তু অনেক সূক্ষ্ম ও ছোট, সেক্ষেত্রে সংযোগ দেয়া ইত্যাদি মোটেই সহজ হতো না। কোন কোন ক্ষেত্রে একই বিষয়ের গবেষণায় সরল থেকে জটিল নানা প্রাণি ব্যবহার করা হয়েছে নানা কারণে। যেমন মস্তিষ্ক কী ভাবে শিক্ষণ প্রক্রিয়া এবং মনে রাখার কাজগুলো করে তা বুঝতে ইঁদুর, মুরগি, শামুকের মত ভিন্ন ভিন্ন প্রাণি ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়েছে। এদের প্রত্যেকের বিশেষ ভূমিকা ছিল এ ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে বেশ জটিল প্রক্রিয়ার উদ্ঘাটন সম্ভব করে তুলতে। এসবের কিছু কিছু আমরা যথাস্থানে বিস্তারিত দেখবো।

বিভিন্ন প্রাণিদের উপর পরীক্ষা নিরিক্ষা করে মস্তিষ্কের কাজের উপর গবেষণাগুলোকে দুটি ভিন্ন শ্রেণিতে ফেলা যায়। প্রথমটি হলো আচরণগত পরীক্ষা। এক্ষেত্রে প্রাণিটিকে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে নিয়ে গিয়ে তার আচরণ লক্ষ্য করা হয়, এবং তার থেকেই মস্তিষ্ক কী ভাবে কাজ করছে তা বুঝার চেষ্টা করা হয়। গত শতাব্দীর শুরুর দিকে বিজ্ঞানী পাভলভের কুকুরের উপর বিখ্যাত পরীক্ষাটি এর একটি বহু পরিচিত উদাহরণ। এর মাধ্যমে কন্ডিশন্‌ড রিফ্‌লেক্স অর্থাৎ অভ্যস্ত হবার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দেখানোর বিষয়টি আবিস্কৃত হয়েছিল। পরবর্তীতে মস্তিষ্কের কাজ আরো বিস্তারিত ভাবে বুঝতে এই আবিষ্কার বিশেষ সহায়ক হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে কিছু গরিলা ও শিম্পাঞ্জিকে সীমিত ভাষা ব্যবহার (ইশারার ভাষা, বা কথার ধ্বনি বুঝে কাজ করার ক্ষমতা) শিখিয়ে এরকম যোগাযোগের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের কাজ বুঝতে পারার যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে। খোলসবিহীন এক রকম শামুক কী ভাবে স্পর্শে সাড়া দেয় তা লক্ষ্য করেই আবিষ্কৃত হয়েছে আমাদের মস্তিষ্ক কী ভাবে শিক্ষনের কাজ করে তার মৌলিক বেশ কিছু বিষয়।

পরীক্ষণের অন্য শ্রেণিতে অবশ্য প্রাণির মস্তিষ্কে আরো সরাসরি পরিমাপের বিষয়গুলো থাকে। এদের মস্তিষ্কে অথবা স্নায়ুতন্ত্রে হস্তক্ষেপ করে, কিছুটা কাটাছেরা করে হলেও বিভিন্ন ইলেকট্রোড ইত্যাদি সংযুক্ত করা হয়। প্রয়োজনে বৈদ্যুতিক বা অন্যান্য প্রক্রিয়ায় উদ্দীপনা সরাসরি মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ

স্নায়ুতে দেয়া হয়। অন্য দিকে সেখানে উৎপন্ন সিগন্যালগুলোও এমনকি তাদের পুরো প্যাটার্নকে সরাসরি পরিমাপের ব্যবস্থা করা হয়। এ ধরনের পরীক্ষা অতীতে হয়েছে, এখনো ক্রমাগত আরো উন্নত প্রক্রিয়ায় হচ্ছে। কিন্তু আজকাল প্রাণিকে এভাবে কষ্ট দিয়ে, কখনো বা তার দৈহিক ও মানসিক ক্ষতি করে পরীক্ষা কাজকে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়। অপেক্ষাকৃত উচ্চতর প্রাণি যারা যাতনা প্রকাশ করতে সক্ষম, তাদের ক্ষেত্রেই আপত্তিটি বেশি আসে। তাই পরীক্ষায় এরকম প্রাণির এ ধরনের ব্যবহার এখন কমে যাচ্ছে। তবে একেবারে নিু বর্গের প্রাণির ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে যাতনা, মৃত্যুভয় এসব তাদের অনুভূত হয়না।

মস্তিষ্কে চিন্তার ছবি

মস্তিষ্কে আমাদের চিন্তা প্রক্রিয়ার গবেষণায় সর্বাধুনিক পদ্ধতি হলো কোন ভাবে এর উপর হস্তক্ষেপ না করে বাইরে থেকেই তার ভেতরের সিগ্ন্যাল প্রক্রিয়াগুলোর চলমান ছবি তোলার ব্যবস্থা করা- অর্থাৎ মস্তিষ্কের ইমেজিং পদ্ধতি। অতি সম্প্রতি চিকিৎসাবিদ্যায় রোগ নির্ণয়ের জন্য যে অত্যন্ত শক্তিশালী ইমেজিং পদ্ধতিগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে ও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তারই সুযোগে চিন্তা প্রক্রিয়ার গবেষণায় এই উন্নয়ন হয়েছে। এটি বিজ্ঞানের এই শাখায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। আগে যা মোটেই সম্ভব হতোনা, অথবা যে পরীক্ষা কিছুটা সম্ভব হলেও তা অত্যন্ত দুরূহ ও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল, এখন তা অনায়াসে কোন ঝুঁকি না নিয়ে অল্প সময়েই নিঁখুত ভাবে করা যায়। পদ্ধতিগুলো এতই চমকপ্রদ যে বলতে গেলে আমরা চিন্তা যখন করছি তখন বাইরে থেকে মস্তিষ্কে চিন্তার সে ছবি দেখা যাচ্ছে। চিন্তাকে যদি কোন বিশেষ দিকে বা বিশেষ কাজে নিবদ্ধ করা হয় সেই ছবি থেকে আমরা বুঝার চেষ্টা করতে পারি এর ফলে মস্তিষ্কের কোন অংশে কী সিগন্যাল তৈরি হচ্ছে, কী পরিবর্তন হচ্ছে, ইত্যাদি। যেমন যখন কিছু শিখছি, কিছু মনে রাখার চেষ্টা করছি, কিছুতে সাড়া দিচ্ছি– তখন মস্তিষ্কের কোন অংশ সক্রিয় হলো, কী ভাবে সক্রিয় হলো তা ঐ ইমেজ থেকেই আমরা বুঝতে পারি। ঐ যে নিউরোনের ফায়ারিং এবং তার সমন্বিত রূপ আতশবাজির কথা বলেছি এই ইমেজে এখন তা সত্যি সত্যি দেখা ও রেকর্ড করে রাখা সম্ভব হচ্ছে। মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক, গঠনগত নানা পরিবর্তন এই ইমেজে ধরা পড়ে। আমরা দেখবো চিন্তা প্রক্রিয়ার প্রায় সব রকমের গবেষণাকে এটি কেমন সহজ ও ফলপ্রসূ করে তুলেছে। চিন্তা সম্পর্কে বর্তমানের অধিকাংশ গবেষণায় তাই ইমেজিং এর

দারুণ প্রভাব রয়েছে। আসলে এরা চিন্তা প্রক্রিয়ার মৌলিক গবেষণা ছাড়াও মস্তিষ্কের রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও খুবই কার্যকর। ড্রাগের প্রভাব, বিষণ্নতা রোগ, আলজাইমার ইত্যাদি স্মৃতিভ্রষ্টতার রোগ ইত্যাদি নির্ণয়ে বিশেষভাবে ফলপ্রসূ। এসব ইমেজিং পদ্ধতি পদার্থবিদ্যার অতি সাম্প্রতিক কিছু আবিষ্কারের ভিত্তিতেই সম্ভব হয়েছে, এবং পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের অত্যন্ত মৌলিক আধুনিক গবেষণায়ও এদের কোন কোনটির নিত্য ব্যবহার রয়েছে। এদের অন্তর্নিহিত নীতিগুলো সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকলে এদের কাজকে বুঝতে তা সহায়ক হবে।

সি এ টিঃ

সি এ টি হলো কম্পিউটার এসিষ্টেড টোমোগ্রাফি এই কথাটির আদ্যাক্ষর নিয়ে গঠিত- ক্যাট স্ক্যান বা সি টি স্ক্যান নামে যেটি চিকিৎসার জগতে এখন সর্বত্র প্রচলিত। এটি মূলত উন্নত এক্সরে ছবি নেয়ার মত। তবে দ্বিমাত্রিক তলে একটি মাত্র ছবি নেয়ার বদলে এখানে শরীরের প্রাসঙ্গিক পুরো অংশকে পাউরুটির অতি পাতলা স্লাইজের আকারে অনেকগুলো কর্তিত অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেকটির একটি ছবি নেয়। ফলে ঐ দেহাংশের ঠিক কোন জায়গায় কী পরিবর্তন ঘটেছে তা ত্রিমাত্রিক ভাবেই উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়। বিভিন্ন স্লাইজের বিভিন্ন ছবির সমন্বয় সাধন করে কম্পিউটার - তাই এর নামের মধ্যে কম্পিটার এসিষ্টেড কথাটি এসেছে। আর টোমোগ্রাফি কথাটির মানে হলো কেটে কেটে দেখা- ঐ স্লাইজে স্লাইজে ভাগ করে ছবি নেয়াটির কথাই তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে ক্যাট স্ক্যান একই কাজ করে পুরো মস্তিষ্ককে অনেক কাল্পনিক স্লাইজে ভাগ করে ফেলে প্রত্যেকটির ছবি তুলে আনে। এর দ্বারা প্রধানত মস্তিষ্কে গঠনগত পরিবর্তনগুলো ধরা পড়ে। কোন কারণে মস্তিষ্কের কোন অংশে কোন ক্ষত হলে, ফাটল ইত্যাদি দেখা দিলে, নানা সমস্যার সৃষ্টি হয় যার মধ্যে চিন্তা সংক্রান্ত সমস্যাও অন্তর্গত। এসব ক্ষত ক্যাট স্ক্যানে সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়।

এম আর আইঃ

মস্তিষ্কে চিন্তা প্রক্রিয়ার গবেষণায় আজকাল সব চেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় এম আর আই এবং পি ই টি নামে পরিচিত দুটি পদ্ধতি। এই উভয়েই আসলে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী পদ্ধতি এবং চিকিৎসাবিদ্যায় নিয়মিতভাবে

ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মধ্যে পি ই টির কথা আমরা একটু পরেই আসবো। এম আর আই হলো ম্যাগনেটিক রিজোন্যান্স ইমেজিং এর আদ্যাক্ষর গঠিত নাম। পদার্থবিদ্যায় বা রসায়নে মৌলিক গবেষণায় ব্যবহৃত নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রিজোনেন্স বা এন এম আর পদ্ধতির সঙ্গে এটি প্রায় অভিন্ন।

এক্ষেত্রে শরীরের প্রাসঙ্গিক অংশ একটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখা হয়। যে কোন পদার্থে এবং আমাদের শরীরেও প্রত্যেকটি পরমাণুর কেন্দ্রে যে নিউক্লিয়াস থাকে তাকে একটি অতি ক্ষুদ্র চুম্বক হিসাবে বিবেচনা করা যায়। চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে এরা সবাই কম্পাসের মত এই ক্ষেত্রের বরাবর হয়ে নিজেদেরকে একই দিকে সাজিয়ে ফেলে। এখন একটি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির রেডিও তরঙ্গ পর পর ক্ষণিকের পাল্‌স হিসাবে এখানে দিলে তার প্রভাবে নিউক্লিয়াসগুলো ঐ চৌম্বক ক্ষেত্র-বরাবর অবস্থান থেকে সামান্য সরে গিয়ে ক্ষেত্রের সঙ্গে একটি কোণ তৈরি করবে। কতখানি সরবে তা নির্ভর করে এটি ঐ রেডিও তরঙ্গের শক্তি কতখানি শোষণ করতে পেরেছে তার উপর। এমনিতেই আমরা নিউক্লিয়াসকে মনে করতে পারি বনবন করে ঘোরা একটি লাটিমের মতো যেই গুণকে পদার্থবিদ্যার ভাষায় বলা হয় স্পিন বা ঘূর্ণন। এখন ক্ষেত্রের অক্ষ থেকে বিচ্যুত ঐ নিউক্লিয়াসটির আচরণ হয় একটি হেলে যাওয়া লাটিমের মত তালে তালে মাথা নুইয়ে দুলতে দুলতে আবর্তন। নিউক্লিয়াসের প্রকৃতি ও তার আশে পাশের প্রতিবেশের প্রভাবের উপর নির্ভর করে প্রত্যেক নিউক্লিয়াসের এরকম আবর্তনের একটি যুৎসই ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে। এই ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে প্রযুক্ত রেডিও তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি মিলে গেলে হেলে যাওয়া দোলনটি সব চেয়ে বেশি হয়। এটি তখন হয় উভয়ের মধ্যে এক ধরনের অনুরণন। হেলে যাওয়ার তীব্রতাটি একটি সিগন্যালের রূপে পরিমাপ করা যায়। রেডিও তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি ক্রমে নিম্ন থেকে উচ্চের দিকে বাড়াতে থাকলে ঠিক অনুরণনের ফ্রিকোয়েন্সিতে পৌঁছা মাত্র সিগন্যাল তীব্রতায় একটি উচ্চ শীর্ষ পাওয়া যাবে। অনুরণন কোথায় ঘটবে, অর্থাৎ এই শীর্ষটি কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে হবে তা আবার নির্ভর করবে ঐ নিউক্লিয়াসের আশে পাশের পরমাণুগুলো কী অবস্থায় আছে তার উপর, কারণ তার উপরেই নির্ভর করছে সেই যুৎসই ফ্রিকোয়েন্সি। কোন কারণে আশে পাশের সেই পরমাণুগুলোতে বা তাদের বিন্যাসে কোন পরিবর্তন ঘটলে রেডিও তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি আছে শীর্ষের অবস্থানটি কিছুটা সরে যাবে। ফলশ্রুতিতে মস্তিষ্কে সকল নিউক্লিয়াসের এই শীর্ষগুলো দিয়ে সৃষ্ট সিগন্যালের ইমেজে পরিবর্তন দেখা দেবে। তা ছাড়া একই ধরনের কারণে শীর্ষের প্রকৃতিটি কম বা বেশি

তীক্ষ্ণ হওয়ার ঘটনাও ঘটবে- যাও ইমেজে ধরা পড়বে। অর্থাৎ ব্যাপারটি দাঁড়ালো এই যে উদাহরণ স্বরূপ মস্তিষ্কে স্নায়ু কোষগুলোতে পরিবর্তন ঘটলে পরিবর্তনের প্রকৃতি মস্তিষ্কের এম আর আই ইমেজ দেখে বুঝা যাবে। এক্ষেত্রে স্নায়ুগুলোতে কী ধরনের পরিবর্তন আমরা আশা করছি?

একটি উদাহরণ নেয়া যাক। আমরা মস্তিষ্কে স্নায়ুকোষগুলোর মধ্যে কোনগুলো কোন কারণে বিশেষ সক্রিয় হচ্ছে তা বুঝতে চাই (স্নায়ু ফায়ার করলে, 'আতশবাজিতে' অংশ নিলে যা হতে পারে)। এখন সক্রিয় স্নায়ুকে অপরিহার্যভাবে বেশি অক্সিজেন নিতে হয় শক্তি যোগাবার জন্য। তাই স্নায়ুতে অক্সিজেন শোষণের পরিমাণ থেকে এর সক্রিয়তার একটি ধারণা পাওয়া যায়। রক্তের লোহিত কণিকায় রয়েছে লোহার পরমাণু। এম আর আই করার সময় এর নিউক্লিয়াসে রেডিও তরঙ্গ শোষণ নির্ভর করবে হেমোগ্লোবিনটি অক্সিজেনের সঙ্গে কতখানি বাঁধা রয়েছে তার উপর। আর অক্সিজেনের সঙ্গে বেশি বাঁধা থাকবে যদি সেখানে স্নায়ু বেশি সক্রিয় হয় তবে। তা হলে শেষ পর্যন্ত এম আর আই ইমেজে ধরা পড়েছে মস্তিষ্কের কোন কোন অংশের স্নায়ুতে রক্তের কোষে বেশি অক্সিজেন যাচ্ছে, অর্থাৎ কোথায় স্নায়ু বেশি সক্রিয় হচ্ছে তা। কোন একটি বিশেষ চিন্তা করিয়ে বা কোন ঘটনা ঘটিয়ে মস্তিষ্কে তার সাড়াকে এ ভাবে এম আর আই ইমেজে জ্বাজ্জল্যমান করে তোলা যায়। এম আর আই এর যে সর্বাধুনিক রূপে মস্তিষ্কের এই বিষয়গুলো সব চেয়ে চমৎকারভাবে ধরা পড়ে তাকে বলা হয় এফ-এম আর আই (ফাংশনাল এম আর আই)।

পি ই টি:

ভেতরের অনেক প্রক্রিয়া অনুসরণের জন্য স্বল্পস্থায়ী তেজষ্ক্রিয় পদার্থ শরীরের মধ্যে ঢুকানোর প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। এর ফলে বাইরে থেকে তেজষ্ক্রিয় পদার্থের নিঃসৃত রশ্মি উদ্ঘাটনের মাধ্যমে জানা যায় ঐ পদার্থ কোথায় কোথায় কতখানি যাচেছ। সাধারণভাবে মস্তিষ্কে এই পদ্ধতিটি কঠিন। কিন্তু পজিট্রন এমিশন টোমোগ্রাফি (পি ই টি) এক্ষেত্রে অত্যন্ত উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। এখানেও খুব দ্রুত অবক্ষয়িত হয় এমন একটি তেজষ্ক্রিয় পদার্থ ইনজেকশন করে রক্তে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এই তেজষ্ক্রিয় পদার্থ থেকে পজিট্রন কণিকা নির্গত হয় যা শিগ্‌গির ইলেকট্রনের সঙ্গে যুক্ত হয় গামা নামে পরিচিত উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির শক্তি ফোটনে পরিণত হয়- দুটি গামা ফোটনে। এদের উদ্ঘাটনের জন্য এমন ডিটেক্টর থাকে যা এক সঙ্গে দুটি গামা ফোটনকে

সূক্ষ্মভাবে ধরে ফেলে পজিট্রনের নিঃসরণের কথা জানিয়ে দেয়। এরকম অনেকগুলো ডিটেক্টর সাজানো থাকে বলে পুরো মস্তিষ্ককে ফালি ফালি হিসেবে নিয়ে এর মধ্যে পজিট্রনের পুরো ম্যাপিং এদের দ্বারা করে ফেলা সম্ভব হয় (যে কারণে একে টোমোগ্রাফি বলা হচ্ছে)।

তেজস্ক্রিয় পদার্থটি রক্তের সঙ্গে মেশে এমন কোন বস্তুর সঙ্গে মিশানো হলে পিইটি ইমেজ থেকে সেই বস্তু মস্তিষ্কে কোথায় কত খানি গেল বুঝা যায়। এভাবে অক্সিজেনের সঙ্গে মেশালে অক্সিজেন স্নায়ুর কোথায় বেশি বা কম গেল

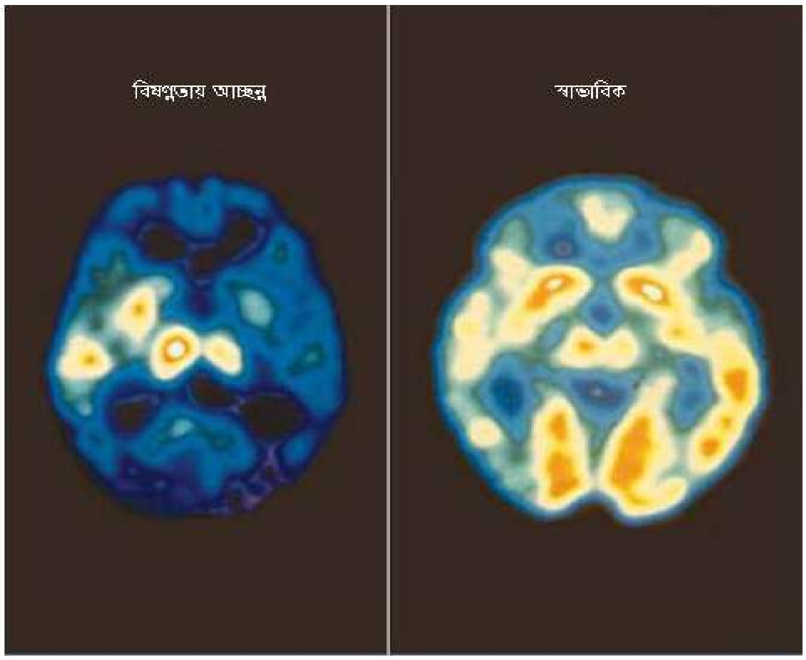

মস্তিষ্কেও পি ই টি ছবিতে বিষণ্ণতার প্রভাব

তা বুঝা যায় (এম আর আইতেও যা আমরা দেখেছি) স্নায়ুর সক্রিয়তা বুঝার জন্য আর একটি উপায় হলো এর গ্লুকোজ গ্রহণের মাত্রা নির্ণয়। স্নায়ু অধিক সক্রিয় হবার জন্য এর গ্লুকোজ গ্রহণের প্রয়োজন হয় খুব বেশি। তেজস্ক্রিয় পদার্থটি গ্লুকোজের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে পিইটি ইমেজে ধরা পড়ে কোথায় গ্লুকোজ গিয়েছে বেশি। বিভিন্ন ধরনের নিউরোট্রান্সমিটারের সঙ্গে তেজস্ক্রিয় পদার্থটি মিশিয়ে শরীরে ঢুকালে কোন অবস্থায় মস্তিষ্কের কোথায় কোন নিউরোট্রান্সমিটারের আধিক্য ঘটছে তা বুঝা যায়- মস্তিষ্কের কাজে যাদের গুরুত্ব খুবই বেশি।

এম আর আই এবং পি ই টি উভয়েই চিকিৎসাবিদ্যায় রোগ নির্ণয়ে এখন অতি নিয়মিত ব্যবহৃত সফল দুটি পদ্ধতি। মস্তিষ্কে চিন্তার গবেষণায় এদের ব্যবহারটিকে বলা যায় চিকিৎসা প্রযুক্তির একটি বিশেষ ধরনের ব্যবহার। এ ক্ষেত্রে প্রায়শ এদের একটির বদলে অন্যটি ব্যবহার করা সম্ভব। তবে সাধারণভাবে এম আর আই এর ব্যয় এবং আয়োজন পি ই টি থেকে কম। তাছাড়া যাদের উপর পরীক্ষা করা হচ্ছে তাদের দেহে তেমন কোন হস্তক্ষেপই এম আর আই তে করতে হয়না, যদিও পি ই টিতে নিরাপদ তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইনজেকশন করার মত কিছুটা হস্তক্ষেপ করতে হয়। অন্য দিকে অবশ্য পি ই টি এম আর আই এর থেকে সূক্ষ্মতর পদ্ধতি, এতে মস্তিষ্কে অক্সিজেন, গ্লুকোজ ইত্যাদির ঘনত্ব বন্টন আরো সূক্ষ্ম ভাবে ইমেজে আনা সম্ভব হয়।

মস্তিষ্কে চিন্তার গবেষণায় এম আর আই এবং পি ই টি এখন সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হলেও এক্ষেত্রে উন্নয়ন কিন্তু থেমে নাই। যেমন ম্যাগনেটো-এনসেফেলোগ্রাফি নামক প্রক্রিয়ায় চৌম্বক ক্ষেত্রের অতি সামান্য রদবদলও সূক্ষ্মভাবে করার মাধ্যমে এর আরো জাজ্বল্যমান ইমেজ তৈরি করতে পারে। এর জন্য SQUID (স্কুইড) নামে পরিচিত পদার্থবিদ্যার একটি অতি আধুনিক কৌশল ব্যবহৃত হচ্ছে। নামটি হলো সুপার কন্ডাকটিভ কোয়ান্টাম ইন্টারফেরেন্স ডিভাইস কথাটির আদ্যাক্ষর। বাধাহীন ভাবে বিদ্যুৎ পরিবহনে সক্ষম দুটি সুপারকন্ডাকটিভ বস্তুর সূক্ষ্ম জংশনের জটিল কোয়ান্টাম গুণের উপর নির্ভর করে এতে অভাবনীয় রকম দুর্বল চৌম্বক ক্ষেত্রেরও পরিমাপ সম্ভব হচ্ছে।

চিন্তার জানালাগুলো : পঞ্চ ইন্দ্রিয়

অনুভূতি-তথ্যের গ্রাহক

চিন্তা প্রক্রিয়াটি যদি হয় তথ্যের প্রসেসিং, তা হলো সেই তথ্য গ্রহণ করার জানালা হলো পাঁচটি ইন্দ্রিয়– কান, নাক, জিহবা, ত্বক ও চোখ। এদের মাধ্যমেই শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ ও দৃশ্যের আকারে বাইরে দুনিয়া থেকে চিন্তার তথ্যগুলো মস্তিষ্কে আসে, চিন্তা প্রক্রিয়ার মধ্যে আসে। এর প্রত্যেকটিতেই বাইরের কোন উত্তেজনায় সাড়া দেবার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট অনুভূতি সৃষ্টি অর্থাৎ তথ্যটি গ্রহণ করার ব্যবস্থা রয়েছে। ঐ উত্তেজনা আসতে পারে আওয়াজ রূপে, গন্ধ রূপে, দৃশ্য রূপে ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে। যথাযথ ইন্দ্রিয়টিতে ঐ সাড়া দেবার ব্যবস্থা থাকে কোন না কোন ধরনের 'অনুভূতি গ্রাহকের' মাধ্যমে। সেন্স রিসেপটর বা অনুভূতির গ্রাহক নামে পরিচিত এই ব্যবস্থাগুলো ইন্দ্রিয় তথ্য থেকে এর উপলব্ধিটি (পারসেপশন) জন্মায়। আগে সাধারণ ভাবে স্নায়ু-সিগন্যাল সৃষ্টি হবার যে প্রক্রিয়া আমরা দেখেছি, এখানেও ব্যাপারটি তাই। অনুভূতির গ্রাহকগুলো থেকে যে সাড়া আসে তা স্নায়ুতন্তুর ঝিল্লিতে সোডিয়াম বা পটাশিয়ামের মত ছোট আয়নের প্রবেশ্যতায় পরিবর্তন ঘটায়। এর ফলে ঝিল্লির দুধারে ভোল্টেজের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন একটি সীমা অতিক্রম করলেই স্নায়ুর ইমপালসের আকারে একটি সিগন্যাল সৃষ্টি হয় মস্তিষ্কের যথাযথ অংশে সিগন্যালগুলোর সৃষ্ট প্যাটার্নই ইন্দ্রিয় তথ্যের উপলব্ধিটি সেখানে সৃষ্টি করতে পারে। উত্তেজনাটি যত বড় হবে সিগন্যালটিও তত তীব্র হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য বৃহত্তর উত্তেজনা সিগন্যালের পৌনপুনিকতা বাড়িয়েই তার প্রতিফলন ঘটাতে পারে।

একটি কথা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে ইন্দ্রিয় যে তথ্য এনে দেয় সেই অনুভূতিটুকুই কিন্তু চূড়ান্ত উপলব্ধির জন্য একমাত্র দায়ী নয়। এক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ভূমিকাটি নির্লিপ্ত একটি জিনিসের মতো নয়। বরং আগে থেকেই মস্তিষ্কে থাকা প্রাসঙ্গিক জ্ঞান, স্মৃতি, আন্দাজ সৃষ্টির ক্ষমতা ইত্যাদিও উপলব্ধিতে যোগ হয়। তাই ইন্দ্রিয় উপলব্ধি সৃষ্টির কাজে মস্তিষ্ক নিজেও সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে থাকে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আমরা পরে দেখবো।

কানের সাড়া দেয়া

বাইরে কানের যেটুকু আমরা দেখি তা শব্দকে এর ভেতরে দক্ষ ভাবে ঢুকিয়ে নেবার একটি ব্যবস্থা। শব্দে বাতাসের যে কম্পন তা সেখানে কানের পর্দাকে কাঁপিয়ে তোলে। এই কম্পন আবার এক ধরনের যান্ত্রিক লিভার ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্তকর্ণে থাকা তরলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সেই তরল থাকে শামুক আকৃতির একটি হাড়ে তৈরি টিউবে যাকে বলা হয় কক্‌লিয়া। কক্‌লিয়া শব্দটির মানেই হলো শামুক। কক্‌লিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত

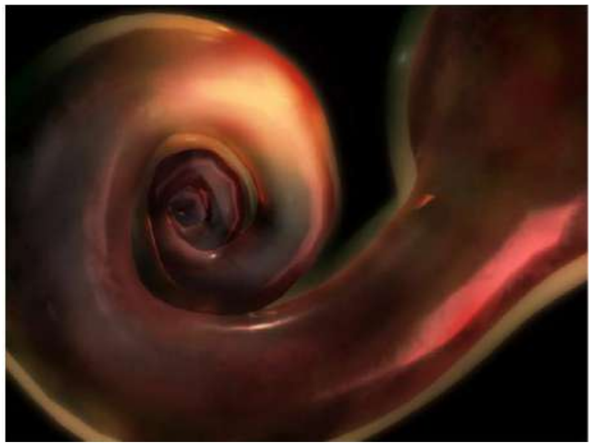

অন্তকর্ণে ককলিয়া

দৃঢ় একটি ঝিল্লির সঙ্গে থাকে ক্ষুদ্র লোমাকৃতি কোষের বাণ্ডিল– সারিবদ্ধভাবে খাড়া। এই লোমাকৃতি কোষগুলো (হেয়ার সেল) কম্পনে খুবই সংবেদনশীল। এর সঙ্গে শ্রবণ স্নায়ুর সিনাপ্‌সগুলো এমন ভাবে থাকে যে সূক্ষ্ম ভাবে একটু খানি বাঁকলেই এতে এ্যাকশন পোটেনশিয়ালের সৃষ্টি হয়। এখানে প্রায় সাড়ে তিন হাজার লোমাকৃতি কোষের প্রত্যেকটি বিশটির মত স্নায়ু এক্সনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এ কোষ বাঁকার প্রকৃতি অনুযায়ী বিদ্যুৎ সিগন্যাল ও নিউরোট্রান্সমিটার বাহিত রাসায়নিক সিগন্যালের আকারে তা মস্তিষ্কে শ্রবণ কোর্টেক্সে চলে যায়।

শব্দ যখন শেষ অবধি কক্‌লিয়ার মাধ্যমে ঐ লোমাকৃতি কোষগুলোকে কাঁপায় তখনই শ্রবণের স্নায়ু সিগন্যালের সৃষ্টি হয়। বাণ্ডিলের বিভিন্ন লোমাকৃতি কোষের শব্দের বিভিন্ন পিচ্‌ বা তীক্ষ্ণতার সাড়া দেবার জন্য বিশেষ ভাবে তৈরি। এরা অতি সূক্ষ্মভাবে এসব ধরতে পারে - শুধু মূল পিচটিই নয় এর আনুসঙ্গিক হার্মোনিক্সের প্রতিও এরা খুবই সংবেদনশীল। এ কারণেই সঙ্গীতজ্ঞরা শুধু কানে শুনেই বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের তার অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বাঁধতে পারেন। মূলত

কার্যকর সাড়ে তিন হাজারের বাইরে আরো বার হাজার লোমাকৃতি কোষ রয়েছে যেগুলো দ্রুতগামী মোটর কোষ হিসাবে কাজ করে শব্দগ্রহণের সংবেদনশীলতা বাড়ায়। শেষ অবধি শব্দ শোনার উপলব্ধিটি যে স্নায়ু সিগন্যালের রূপেই আসে তার একটি প্রমাণ হলো আজকাল গুরুতর বধিরতার ক্ষেত্রে কক্লিয়াতে ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক যন্ত্র প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে শব্দজাত বৈদ্যুতিক সিগন্যাল তার থেকে সরাসরি শ্রবণ স্নায়ুতে যেতে দিয়ে শ্রবণ ক্ষমতা সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে - কানের স্বাভাবিক ব্যবস্থাগুলোর ব্যবহার ছাড়াই।

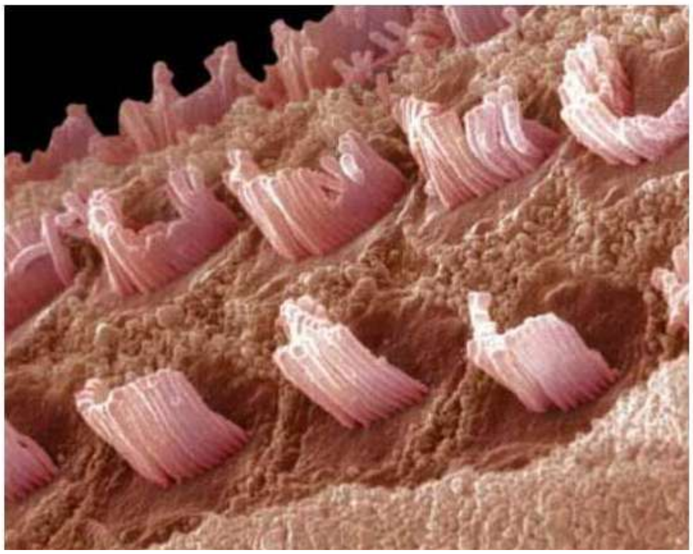

অন্তকর্ণে লোম-কোষ

শ্রবণের উপলব্ধিটি সৃষ্টি হয় শ্রবণ কোর্টেক্সে যা আবার মস্তিষ্কের বাম গোলার্ধে অবস্থিত ভাষা অঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি সংলগ্ন। আসলে ভাষার ক্ষমতার সঙ্গে কথা শোনা ও তার অর্থ অনুধাবনের ব্যাপার দুটো অঙ্গাঙ্গিক জড়িত হওয়াতেই এমনটি হয়েছে।

স্পর্শের অনুভূতি

স্পর্শের অনুভূতি গ্রাহক ছড়িয়ে রয়েছে সারা শরীরে ত্বকে, যদিও ত্বকের কোন কোন অংশে তার সংবেদনশীলতা অধিক। যান্ত্রিক চাপ থেকে কার্যকর হয় বলে এগুলো এক ধরনের মেকানোরিসেপ্টর ক্যাপসুলের রূপে থাকে। ত্বকের ভেতরের দিকে বেশ বড় বড় এরকম অনুভূতি-গ্রাহক থাকে - যেগুলো ২/১ মিলিমিটার সাইজের। উপরের দিকে থাকে আরো ছোট গ্রাহক। একেবারে

উপরে লোমের গোড়ার কোষও সংবেদি স্নায়ুর কারণে গ্রাহকের কাজ করে। এগুলো অনেক বেশি ফ্রিকোয়েন্সিতেও কার্যকর থাকে।

স্পর্শের অনুভূতি-গ্রাহক থেকে সিগন্যালকে প্রাথমিক ভাবে মেরুদণ্ড বা ব্রেইন ষ্টেমের মত আদি মস্তিষ্কের অঞ্চলেই পাঠানো হয়। এখানে যে ধরনের স্পর্শ উপলব্ধি হয় তা বিবর্তনে অনেক প্রাচীন তাই অনেক নিুতর প্রাণির মধ্যেও বিদ্যমান। স্পর্শের এই এরকম উপলব্ধি এভাবে প্রাণিজগতে ব্যাপকভাবে আছে। তারা বহির্জগতের প্রতি একেবারে আটপৌরে মামুলি সাড়া দেবার জন্য এই স্পর্শের উপরই নির্ভর করে। মানুষ বা প্রাইমেটের মত উচ্চতর প্রাণিতে চূড়ান্ত উপলব্ধিটি হয় থ্যালেমাসের মাধ্যমে কোর্টেক্সে গিয়ে আরো সূক্ষ্মতর ভাবে। এখানে মস্তিষ্কের ভাল সক্রিয়তা রয়েছে। এমনি একটি সক্রিয়তা হচ্ছে মূল স্পর্শানুভূতিটিকে উচ্চকিত করার জন্য এর আশেপাশের সব গ্রাহক থেকে আসা সিগন্যালকে অবদমিত করার ব্যবস্থা। এভাবে কোর্টেক্স শুধু মূল স্পর্শানুভূতিকে মনোযোগে এনে এর উপর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্রীভূত করতে পারে।

ত্বকে স্পর্শ অনুভূতি-গ্রাহকের কাছাকাছিই রয়েছে অন্যান্য রকম সংবেদনশীল অনুভূতি গ্রাহক- যেমন ব্যথা-গ্রাহক (নোসিসেপটর) তাপ-গ্রাহক (থার্মোরিসেপটর) ইত্যাদি। এদের কোন কোনটিকে উচ্চকিত করে অন্যগুলোকে অবদমিত করা যায়। এর থেকেই সম্ভব হয়েছে ব্যথা নাশের বহুপ্রচলিত পুরানো একটি পদ্ধতি– ব্যথার জায়গায় হাত বুলালে বা ঘষলে ব্যথাটি কম বোধ হয়। একই ভাবে তাপ প্রয়োগে অথবা অন্য কোন সংবেদনশীল জিনিস প্রয়োগ করে ব্যথা কমানো যায়। এক্ষেত্রে স্পর্শ- গ্রাহক বা তাপ- গ্রাহককে উচ্চকিত করার ফলে ব্যথা-গ্রাহককে অবদমিত করার কৌশলকে ব্যবহার করা হচ্ছে মস্তিষ্কের ঐ ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে।

স্বাদ ও গন্ধ গ্রহণ

গন্ধ গ্রহণের সূক্ষ্ম ক্ষমতা প্রাইমেট ও মানুষের মধ্যে বরং বেশ কিছুটা কমে গেছে। গন্ধ অনুভূতির গ্রাহকগুলো রয়েছে নাকের উপরে ও পেছনে বায়ুপথে ঝিল্লির সঙ্গে। উদ্বায়ী বস্তু দিয়ে বাহিত হয়ে আসা গন্ধ এখানে সংবেদনশীলতার সৃষ্টি করে। বিশেষ বিশেষ গন্ধ বিশেষ বিশেষ ধরনের স্নায়ু সিগন্যাল এখানে সৃষ্টি করে। কোর্টেক্সে এসব সিগন্যাল যাচাই বাছাই হয়। বিভিন্ন গন্ধের জন্য সাড়া এটি দেয়, নানা গন্ধের মিশ্র রূপ সৃষ্টি করে, এমন কি তা দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির কোঠায় রেখেও দিতে পারে। বহু কাল পরে এই গন্ধের দ্বারা ট্রিগার হয়ে আরো অনেক স্মৃতি মনে পড়ে যেতে পারে।

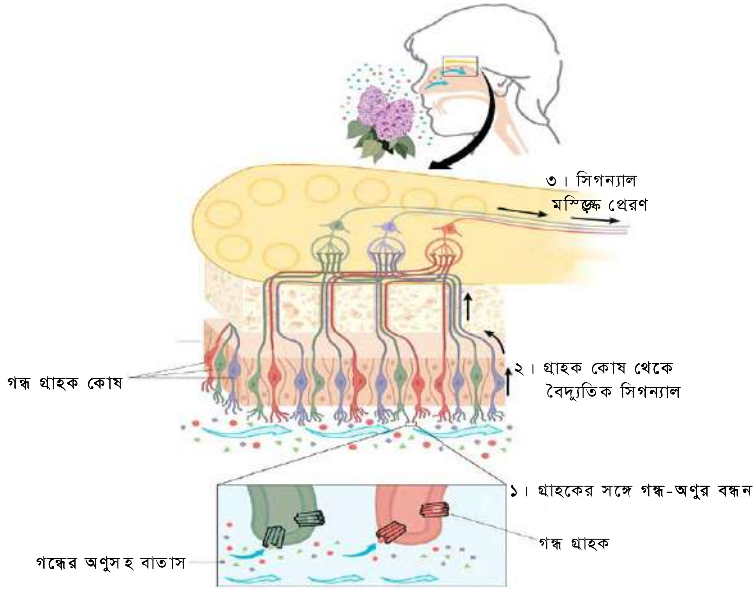

মস্তিষ্কে গন্ধের বোধ

স্বাদ অনুভূতির গ্রাহকগুলো পৃথক জায়গায়– জিহবায়। জিহবার নানা অংশে রয়েছে স্বাদের বিভিন্ন রকম গ্রাহক এক একটি এক ধরনের স্বাদের জন্য। মিষ্ট, তেতো, নোনতা, টক এসব স্বাদই স্পষ্টত পৃথক। তবে তার সঙ্গে উমামি নামের একটি স্বাদকেও জায়গা দিতে হয় যা অন্যগুলোর থেকে পৃথক গ্লুটামাইট বা টেষ্টিং সল্টের স্বাদকে বুঝায়- চীনা-জাপানি খাদ্যে যার

চল বেশি। ঐ উমামি শব্দটিও জাপানী। অবশ্য যাকে আমরা সামগ্রিক ভাবে স্বাদ গ্রহণ বলি সেটি শুধু জিহবার ব্যাপার নয়- তার সঙ্গে গন্ধ গ্রহণেরও ব্যাপার। বিরিয়ানির বিশেষ সামগ্রিক স্বাদ কিংবা কোন চাইনিজ খাবারের স্বাদ যখন আমরা পাই তার উপলব্ধির ঘটনাটি ঘটে মস্তিষ্কে। সেখানে কোর্টেক্সে স্বাদ এলাকার ঠিক নিচেই খুব কাছে রয়েছে গন্ধ এলাকা। উভয়ে একাকার হয়েই উপলব্ধিটি দেয় বলে গন্ধ ও স্বাদ অবিচ্ছেদ্য।

দর্শন অনুভূতি চিন্তার অনেকখানি জুড়ে

বিবর্তনের ইতিহাসে বুদ্ধির অভিযাত্রায় বানর প্রভৃতি প্রাইমেটদের অগ্রগতির একটি বড় কারণ মনে করা হয় দৃষ্টির উপর তার অধিক নির্ভরশীলতা। খুব সম্ভব আদি প্রাইমেটরা পতঙ্গভোজী ছিল বলে দ্রুত গতিশীল ছোট পতঙ্গের অবস্থান ও গতি এক সঙ্গে নিরূপন করে ধরতে পারার জন্য তার মস্তিষ্কের দৃষ্টি-

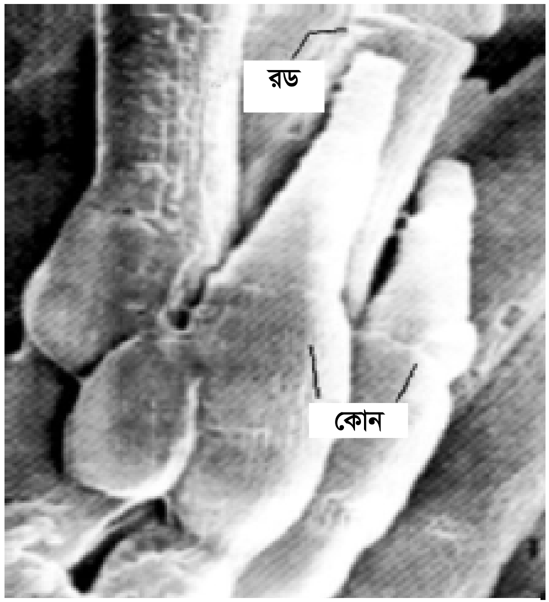

রেটিনায় রড ও কোন

বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এজন্য দর্শন কোর্টেক্সকে বড় হতে হয়েছে, সে কারণে পুরো মস্তি-ষ্ককেও বড় হতে হয়েছে। আমাদের জন্যও বহির্বিশ্বের মানসিক মডেল গড়ার কাজে দর্শন ক্ষমতাটি সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রেটিনা ছাড়া চোখের বাকি সব অংশের কাজ দক্ষভাবে দৃশ্যমান বস্তুর ছবিটি রেটিনার উপর ফোকাস অবস্থায় ফেলা। এদের কাজ অনেকটা ক্যামেরার মত, ফিল্মের উপর এনে ছবিটিকে ফেলা। ফিল্মের সঙ্গে, বা আরো সঠিক ভাবে ডিজিটাল ক্যামেরার সংবেদনশীল পর্দার সঙ্গে, তুলনীয় হলো রেটিনা– দর্শন অনুভূতির প্রক্রিয়া সেখান থেকেই শুরু।

ল্যাটিন ভাষায় জাল শব্দটি থেকেই এসেছে রেটিনা কথাটি। এই জাল তৈরি হয় ঘন সংবদ্ধ অনেক গুলো ‘রড’ ও স্বল্পতর সংখ্যক ‘কোন্’ নামক অংশ দিয়ে।

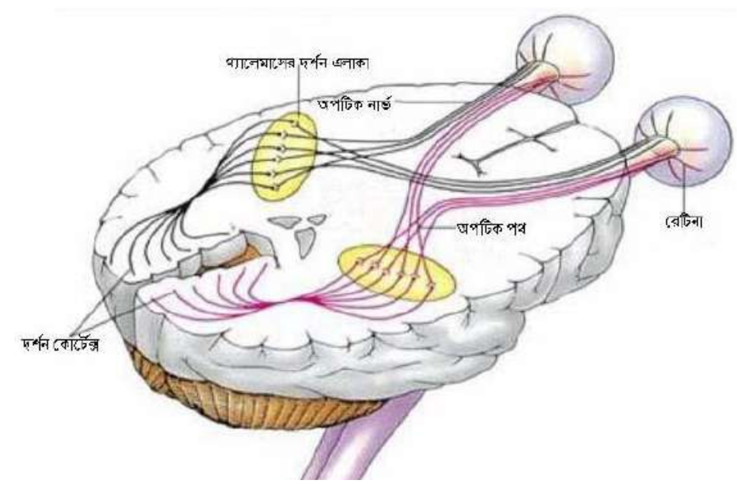

মস্তিষ্কে দর্শনের আয়োজন

দণ্ডের আকৃতির বলে একটিকে রড, এবং ফানেলের আকৃতির বলে অন্যটিকে কোন বলা হয়। মানুষের ক্ষেত্রে প্রতি চোখে রডের সংখ্যা প্রায় ১০ কোটি এবং কোনের সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ। উভয়ের কাজের মধ্যে তফাৎ রয়েছে। রড শুধু দৃশ্যের উজ্জ্বলতার প্রতি সংবেদী– প্রধানত রাতের আবছা আলোতে দেখার জন্য এগুলো জরুরী।

'কোন্' ব্যবহৃত হয় দিনের আলোতে আর রঙিন রূপ দেখতে। সব রকম রঙের ধারণা সৃষ্টি হয় তিনটি মৌলিক রঙ নানা ভাবে মিশিয়ে। এই তিনটি মৌলিক রঙের জন্য তিন রকম পৃথক কোন রয়েছে। রড ও কোন উভয়েই কিন্তু মূল দৃশ্যের আলোতে সাড়া দেয় পটভূমি আলোর চেয়ে সেটি কতখানি বেশি বা কম জোরালো অবস্থায় আছে তা পরিমাপ করার মাধ্যমে। রেটিনা সংলগ্ন স্নায়ুকোষগুলো এভাবে একই দৃশ্যের দুটি অনুভূতি-গ্রাহক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে- একটি পটভূমির চেয়ে অধিক আলোতে সাড়া দেয়, অন্যটি তার চেয়ে কম আলোতে। এর ফলশ্রুতি হয় আশে পাশের আলোর সাড়াকে অবদমিত করে মূল দৃশ্যটিকে উচ্চকিত করা- অন্যান্য অনুভূতির ক্ষেত্রেও স্নায়ু যা করে থাকে। রেটিনা সংলগ্ন স্নায়ুকোষ থেকে দীর্ঘ এক্সনগুলোই অপটিক নার্ভ রূপে মস্তিষ্কে যায়। এরকম রেটিনার দুই অংশের বেশ কিছু এক্সনের বাণ্ডিল পরস্পরকে ক্রস করে মস্তিষ্কের দুই বিপরীত পাশে চলে যায়, আবার বাকি কিছু অংশ যে দিকের চোখ মস্তিষ্কের সেই একই পাশে থাকে- যদিও ভিন্ন স্তরে যায় বলে এদের মধ্যে যোগাযোগ এ পর্যায়ে ঘটেনা। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কোর্টেক্সে গিয়ে শুধু একই রেটিনার বিভিন্ন অংশের নয়, দুই চোখের থেকে আসা একই দর্শন ক্ষেত্রের ভিন্ন আঙ্গিকের তথ্য পরস্পর মেশে যার মাধ্যমে মস্তিষ্কেই বাইনোকুলার দর্শন-উপলব্ধির সৃষ্টি হয় (দুই চোখের মিলিত উপলব্ধি)। এর ফলেই দৃষ্টির গভীরতা অনুভূত হয় অর্থাৎ দৃশ্যের কোন অংশ অন্য কোন অংশের পেছনে আছে সেই বোধ জন্মে।

কোর্টেক্সে দর্শন ম্যাপ

মস্তিষ্কের পেছনের দিকে থাকা দর্শন কোর্টেক্স বেশ বড়, ও তা জটিল কাজে সক্ষম। এখানকার নিউরোনগুলো বিভিন্ন কাজে বিশেষায়িত রয়েছে। একদল নিউরোন বিশেষায়িত হয়েছে দৃশ্যের অবস্থান-ভঙ্গিটিকে ধারণ করার কাজে। আরেক দল দৃশ্যের আলোক-কনট্রাষ্ট অর্থাৎ উচ্চ আলোকিত ও কম আলোকিত অংশের ব্যবধানকে ধারণ করে। এরকম আরেকটি দলের কাজ দৃশ্যের গতিশীলতাকে অনুধাবনে আনা, বিশেষ করে গতি কোন দিক থেকে কোন

দিকে সেই অনুভূতিকে। এমনি অন্যান্য দল কোনটি দৃশ্যের রঙকে, কোনটি দৃশ্যের গভীরতাকে ইত্যাদি ধারণ করে) যে দৃশ্য আমরা দেখছি তার এক ধরনের ম্যাপ দর্শন কোর্টেক্সে সৃষ্টি হয়। দৃশ্যের বেশ খুঁটিনাটিও এই ম্যাপে স্থান পেতে পারে– এমনকি দৃশ্যের এক মিলিমিটার জায়গার মধ্যে যা আছে তাও। এই ম্যাপের মাধ্যমে মস্তিষ্কে কিছু সুশৃঙ্খল নক্‌শা অনুধাবিত দৃশ্যটির হুবহু প্রতিনিধিত্ব করে। আসল দৃশ্যের আলো রেটিনায় যে বিন্দুতে যেভাবে পড়ে তার প্রতিনিধিত্বকারী একটি বিন্দু এই ম্যাপে থাকে, যেখানে ইলেকট্রোড দিয়ে ঐ আলোর থেকে সৃষ্ট স্নায়ু সিগন্যাল মাপা যায়। বানরের মস্তিষ্কে অস্ত্রোপাচারের মাধ্যমে ইলেকট্রোড দিয়ে এভাবে ম্যাপ অনুসরণ করে এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। যেমন দর্শন কোর্টেক্সে এই ম্যাপের এলাকায় একটি ছিদ্র করলে দৃশ্যের যে অংশটির নক্‌শা ঐ ছিদ্রের মধ্যে পড়ে তা বানর দেখবেনা– ওখানটিতে একটি অদৃশ্য অঞ্চল (ব্লাইণ্ড স্পট) সৃষ্টি হয়। ব্যাপারটি পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে।

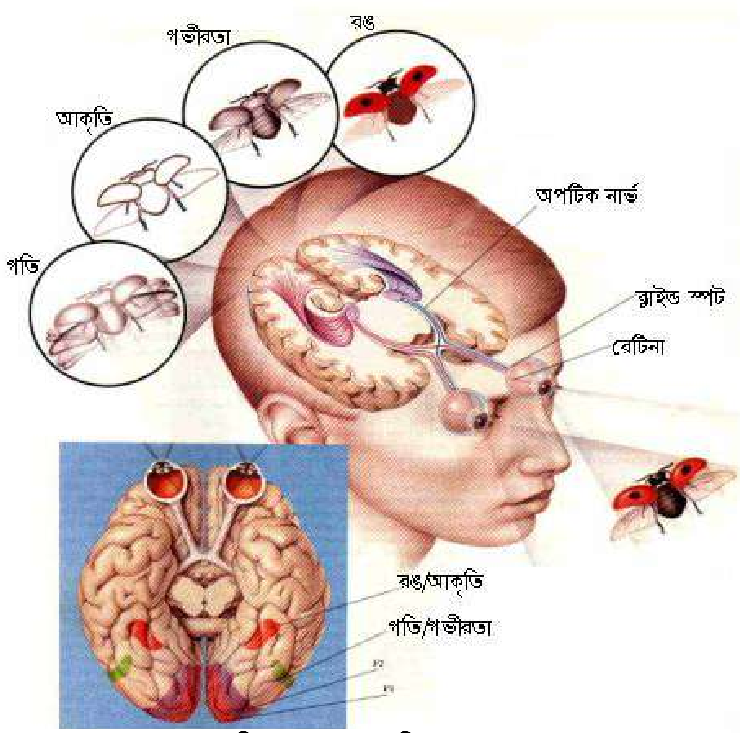

চোখ আর মস্তিষ্ক একযোগে দৃষ্টির বোধগুলো দেয়

অদ্ভূত ব্যাপার হলো এভাবে কোর্টেক্সে একই দৃশ্যের শুধু একটি ম্যাপ হয়না বরং তার বিভিন্ন গুণ নিয়ে বিভিন্ন ম্যাপ হয় নানা জায়গায়। এর কোনটি হয়তো দৃশ্যের উজ্জ্বলতার ম্যাপ, কোনটি রঙের ম্যাপ, কোনটি অবস্থানগত ভঙ্গির ম্যাপ, কোনটি গতিশীলতার ম্যাপ- ইত্যাদি। এর সবগুলো মিলিয়েই দর্শনের অনুধাবনটি সৃষ্টি হয়। এরকম একাধিক ম্যাপের প্রয়োজনীয়তাটি কেন দেখা দিল? সেই কারণটিও চমকপ্রদ। আমরা দেখেছি বিভিন্ন ক্ষেত্রেই একটি সক্রিয় নিউরোন তার আশে-পাশের নিউরোনে অবদমনের সিগন্যাল পাঠিয়ে দেয় ওগুলোকে অবদমিত করে নিজের সিগন্যালটিকে উচ্চকিত করার জন্য। দৃশ্যের সব গুণগুলো যদি একই ম্যাপে ধারণ করা হয় সব তথ্যকে ম্যাপে সংকুলান করতে ম্যাপটি অর্থাৎ একটানা উচ্চকিত নিউরোনের অঞ্চলটি বেশ বড় হতে হবে। ফলে ঐ অবদমনের সিগন্যাল পাঠাতে হবে বেশ খানিকটা দূরে। এতে ওখানে স্নায়ুর পরস্পর সংযোগ ব্যবস্থা অদক্ষ হয়ে পড়ে। উজ্জ্বলতা, রঙ, অবস্থান ইত্যাদি থেকে শুধু একটি বা অল্প দু'একটি গুণ নিয়ে ম্যাপ করলে প্রত্যেকটিতে ঐ দূরত্ব কম রাখা যায়, স্নায়ু-যোগাযোগ দক্ষতর হয়। তাই মস্তিষ্কের নানা স্থানে একাধিক ম্যাপের সমন্বয়েই দর্শন-অনুভূতির সম্পূর্ণ অনুধাবন ঘটে। ব্যাপারটি শুধু তাত্ত্বিক ভাবে বলা হচ্ছেনা বরং নানা পরীক্ষণে এভাবে একাধিক ম্যাপের ও তার কারণের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এমনি একটি পরীক্ষণে অণুবীক্ষণের তলায় রেখে মস্তিষ্কে ইলেকট্রোড দিয়ে পরীক্ষা করে অবদমনের সিগন্যালের পথগুলো স্বল্প দৈর্ঘের দেখা গেছে– তুলনামূলকভাবে কম তথ্য নিয়ে গঠিত এক একটি ম্যাপ ছোট বলেই যা সম্ভব। অন্যদিকে দৃশ্যের মানসিক অনুধাবন সৃষ্টির জন্য সব সিগন্যাল যখন কর্পাস কলোসামের সদর রাস্তা দিয়ে কোর্টেক্সের উচ্চ স্তরে যায় তখন তার স্নায়ু বাণ্ডিলের মধ্যে বিভিন্ন ম্যাপ থেকে আসা স্নায়ুতন্তুগুলোকে আলাদাভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। আরো স্পষ্ট প্রমাণ হলো যে সব দুর্ঘটনায় দর্শন কোর্টেক্সের একটি ছোট অংশ শুধু স্থানীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় সেক্ষেত্রে দেখার সবগুলো ক্ষমতা নষ্ট হয়না। হয়তো দৃশ্যের উজ্জ্বলতা বুঝা যাচ্ছে, কিন্তু রঙ বুঝা যাচ্ছেনা- এমনটিই হয়। এক এক গুণের ম্যাপ এক এক জায়গায় ছড়ানো বলে সবগুলোর ক্ষমতা এতে নষ্ট হচ্ছে না।

চোখে দেখা মনের ছবি

শেষ পর্যন্ত কিন্তু দৃশ্যের অনুধাবনটি ঘটে একটি মানসিক চিত্রে। বানর প্রভৃতি প্রাইমেটে এসে জীব বিবর্তন উন্নত দর্শন কোর্টেক্সের মাধ্যমে এরকম মানসিক

চিত্র সৃষ্টির উন্নয়ন ঘটিয়েছে। মনে করা হয় বুদ্ধির অভিযাত্রায় এটি একটি বড় পদক্ষেপ। এই মানসিক চিত্রটি পুরাপুরি কিন্তু চোখ থেকে আসছেনা। এটি আমাদের স্মৃতির অংশ থেকেও আসছে, এই চিত্র মস্তিষ্ক নিজেও অনেকখানি তৈরি করে দেয় ঐ স্মৃতির সহায়তায়। যদিও আমরা একে চিত্র বলছি সেই চিত্র কিন্তু 'পিকচার' অর্থে নয় বরং একটি মানসিক 'ইমেজ' অর্থে। পিকচার জিনিসটি বাইরের জিনিস– একটি ফটোগ্রাফের মত। একে আমরা নাড়াচাড়া করতে পারি, দেয়ালে টাঙ্গাতে পারি, এর উপর সম্পাদনাও করতে পারি। কিন্তু ইমেজটি আভ্যন্তরীণ, তাকে আমরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারিনা। এভাবে মস্তিষ্ক নিজেই আমাদের জন্য এমন সব অনুধাবনের সৃষ্টি করতে পারে যেখানে বাহ্যিকভাবে আমাদের কিছু করার নাই। একারণেই বাস্তব দৃশ্যে না থাকলেও মস্তিষ্ক আমাদের জন্য ইল্যুশন বা দৃষ্টি বিভ্রম সৃষ্টি করতে পারে। আমরা অবশ্য এখানে অপটিক্যাল ইল্যুশন বা আলোর ধর্ম সংক্রান্ত বিভ্রমের কথা বলছিনা। সেগুলো বাইরের ব্যাপার যেমন গ্লাসের পানিতে ডুবানো পেন্সিলকে বাঁকা দেখা। এখানে আমাদের বিবেচ্য মস্তিষ্কের কারণে ঘটা বিভ্রম। এদের মধ্যে কোন কোনটি আমাদের জন্য খুবই উপকারীও হয়। বাইনোকুলার দর্শন অর্থাৎ দুই চোখ দিয়ে একই দৃশ্য দেখে গভীরতার ধারণা পাওয়াটি এরকম একটি। এর মাধ্যমে আমরা দেখা ইমেজে নানা অংশের সামনে-পেছনে থাকার ধারণাটি পেয়ে যাচ্ছি। সিনেমা দেখাতেও আমরা এমনি একটি অনুভূতির বিভ্রমের সুযোগ নিচ্ছি। এক একটি ছবির মানসিক ইমেজটি ক্ষুদ্র একটি সময় মস্তিষ্কে স্থায়ী হয়ে থাকে বলে পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ছবিকেও আর একটি না আসা পর্যন্ত আগেরটির রেশ মস্তিষ্কে আমরা ধরে রাখতে পারি বলেই চলচ্চিত্রের অনুভূতি সম্ভব হয়।

একটি নীল দৃশ্যের দিকে অনেক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সাদা দেয়ালের দিকে তাকালে সেখানে হলুদ রঙে একই দৃশ্যের ইমেজ সৃষ্টি হয়, যদিও আসলে সেখানে কোন দৃশ্য নাই। এই 'আফটার ইমেজটি' সৃষ্টি হয় নীলের দিকে অধিক্ষণ তাকাতে তাকাতে রেটিনায় নীল সংবেদনশীল 'কোন্'গুলো ক্লান্ত হয়ে কিছুটা অকার্যকর হয়ে যার বলে। তখন সাদা দেখার সময় নীলের 'কোন্' কাজ না করাতে দৃশ্যের মত ইমেজে বাকি দুই মৌলিক রঙ লাল ও সবুজ উচ্চকিত হয়। এই দুটো মিলে ওখানে হলুদ রঙের ধারণা সৃষ্টি হয়। এ ধরনের দৃষ্টি বিভ্রমের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

একই ভাবে অনেক সময় স্নায়ুর প্রসেসিং এর সমস্যার জন্য দর্শনে কিছু বিঘ্নও সৃষ্টি হতে পারে, যেমন হয় রঙ-কানা (কালার ব্লাইন্ড) হবার মধ্যে। রেটিনাতে

যে সব 'কোন্' নীল রঙে সাড়া দেয় আর যে সব 'কোন্' সবুজ রঙে তাদের প্রোটিন গঠনে মাত্র ৪% এমাইনো এসিডের তফাৎ থাকে। খুব সম্ভব বিবর্তনের ইতিহাসে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে প্রাইমেটদের কাছে সবুজ পাতার ভেতরে লাল রঙের টসটসে পাকা ফলকে আলাদা করার প্রয়োজন থেকে এই তফাতের মাত্রা সূত্রপাত মাত্র হতে পেরেছে। তফাৎ কম হওয়াতে মানুষের জিনে আদৌ এই তফাৎ না থাকার বা কম থাকার মিউটেশন (দৈবাৎ জিন পরিবর্তন) ঘটার সম্ভাবনা বেশি, এবং হয়েছেও তাই। এরই ফলশ্রুতিতে অনেকের মধ্যে লাল ও সবুজকে পার্থক্য করার ক্ষমতাটি ভালমত থাকেনা লাল আর সবুজের মধ্যে ছাড়াও অন্য রকম রঙ-কানা হবার প্রবণতাও রয়েছে।

অনুভূতিতে মস্তিষ্কের খেলা

বাইরের জগতের কোন সত্যিকার উত্তেজনা ছাড়াই যদি আমরা সে রকম উত্তেজনাকে উপলব্ধি করতে থাকি তা হলে সেটি হবে শুধুমাত্র মস্তিষ্কেরই সৃষ্ট। অনেকেই এরকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছে এমন কথা আমরা প্রায়শ শুনি, নিজেরাও এমন অভিজ্ঞতা কখনো কখনো পেতে পারি। এ ধরনের অলীক উপলব্ধি সব রকম অনুভূতির ক্ষেত্রে হতে পারে– গায়েবী আওয়াজ, গায়েবী দৃশ্য, গায়েবী স্পর্শ এর সবই অনুভূত হতে পারে। মস্তিষ্কে যে চিন্তা চলেছে বা সেখানে স্মৃতিতে যা আছে তারই প্যাটার্নকে বাইরের সত্যিকার কিছু অনুধাবনের প্যাটার্ন বলে ভুল হলেই এটি ঘটে। এর মধ্যে অবশ্য গভীর আবেগ অথবা প্রত্যাশার একটি ভূমিকা থাকে। ঐ আবেগ বা প্রত্যাশার কারণে কোন কিছু দেখার বা শোনার জন্য আমরা খুবই সজাগ হয়ে থাকি। এরকম উচ্চ মাত্রার সজাগতার ফলে অন্যদিকে বিচার-বুদ্ধির যে সতর্কতা সেটি কিন্তু অনেকটা হ্রাস পায়। এই দুইয়ের মোট ফল হয় যা দেখার প্রত্যাশা করছি, বা আশঙ্কা করছি, তা দেখতে, যা শুনতে চাচ্ছি তা শুনতে পাওয়া। 'আমি কান পেতে রই . . . ' এরকম আবেগকে যদি বেশি প্রত্যাশায় নিয়ে যাই তখন কি শুনছি তার বিচার ক্ষমতা লোপ পায়, না শুনেও তখন শুনার অভিজ্ঞতা হতে পারে। সে জন্য জাহাজ ডোবা নাবিক নির্জন দ্বীপে আটকে গিয়ে যখন অধীর প্রত্যাশায় জাহাজের অপেক্ষায় দিগন্তের দিকে একটানা তাকিয়ে থাকে, তখন প্রায়শ এরকম অনেক অলীক জাহাজ দেখতে পেয়ে পরে নিরাশ হয়। মৃত আত্মাকে হাজির করবার তীব্র আকাঙখায় সে রকম ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করলে তবে গায়েবী আওয়াজ পাওয়ার অলীক অনুভূতি হতে পারে।

এই অনুভূতিরই আর একটি রূপ দেখা দিতে পারে এক ধরনের রোগের আকারে, যা মাথার মধ্যে নাছোড়বান্দা কিছু চিন্তার ফলে সৃষ্টি হয়। যেমন প্রায়শ এরকম রুগীকে দেখা যায় সর্বত্র সব কিছুর মধ্যে ময়লা দেখতে, নিজের হাতের মধ্যেও। তাই সব সময় তাকে হাত ধুতে দেখা যায়। এরকম ময়লার অনুভূতি কিন্তু বাস্তব থেকে আসছেনা, আসছে রুগীর মস্তিষ্ক থেকে।

এমনি আর একটি দুঃখজনক উদাহরণ হলো অঙ্গ হানির ক্ষেত্রে ঐ স্থলে অলীক অঙ্গের উপস্থিতি অনুভব করা। রোগ বা দুর্ঘটনার কারণে কারো যদি পা কেটে ফেলতে হয়, রুগী কিন্তু অনেক সময় ঠিক জায়গায় পা আছে বলেই অনুভব করেন। এটি শুধু হাত পায়ের ক্ষেত্রেই নয় বরং দেহের অন্য যে কোন অঙ্গ হানির ক্ষেত্রেই হতে পারে- মুখ, চোয়াল, পায়ুপথ, যৌনাঙ্গ সব কিছুর ক্ষেত্রে। এরকম অলীক অঙ্গের অনুভূতির বেশ কয়েক রকম কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে। একটি হলো কর্তিত অংশের কোষকলায় যে স্নায়ুপ্রান্ত থাকে তার থেকে পূর্ববৎ সিগন্যাল পাওয়া। আর একটি হলে মস্তিষ্কে অঙ্গের অনুভূতির অঞ্চলগুলোতে সিগন্যাল প্যাটার্নের ম্যাপ এখনো থেকে যাওয়া। এর ফলে এক জায়গা থেকে আসা অনুভূতি অন্য জায়গার বলেও অনুভূত হতে পারে। যেমন মুখে কারো আঙ্গুলের স্পর্শ পেলে নিজের হারানো আঙ্গুলের মধ্যে সেই স্পর্শ অনুভব করা। বংশগত ভাবে পাওয়া বিভিন্ন অঙ্গের অনুভূতি মস্তিষ্কে যেভাবে গাঁথা হয়ে আছে অঙ্গ হানি হবার পরও তা সেখানে আংশিক থেকে যেতে পাচ্ছে, অলীক অঙ্গের সেটিও একটি কারণ। আধুনিক ইমেজিং পদ্ধতিতে রুগীর স্নায়ু স্ক্যান করে এই সব কারণের বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া গেছে।

ইন্দ্রিয়ের জানালা দিয়ে চিন্তার সকল কাঁচামাল আসে একথা সাধারণভাবে সঠিক হলেও এর অনেকগুলো ব্যতিক্রমও আমরা দেখতে পেলাম। শেষ পর্যন্ত সব রকম উপলব্ধি বা অনুধাবনের ঘটনাটি ঘটে মস্তিষ্কে। মস্তিষ্ক ঐ কাজে ইন্দ্রিয়ের সহায়তা নিতেও পারে, অনেক সময় না নিয়েই নিজে থেকেই অনুধাবন সৃষ্টি করতে পারে।

মস্তিষ্কে স্মৃতির জমিন

আমাদের স্মৃতি আর কম্পিউটারের মেমোরি

কম্পিউটারের কার্যকরিতায় তার মেমোরির যেমন কেন্দ্রীয় স্থান, আমাদের চিন্তা-চেতনায়ও স্মৃতির ভূমিকা খুবই কেন্দ্রীয়। সব ধরনের শেখার জন্য স্মৃতি অপরিহার্য। যে কোন যৌক্তিক বিবেচনার জন্য যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য স্মৃতির ভাণ্ডার ব্যবহার করতে হয়। পরিকল্পনা করতে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে স্মৃতির সঞ্চয় চাই। এমনকি কল্পনার পাখা মেলতে হলেও কিছু স্মৃতির পূঁজি থাকতে হয়। শারীরিক ভাবেও কোন কুশলতা বা দক্ষতার প্রকাশ ঘটাতে হলেও এক ধরনের স্মৃতিরই বহিপ্রকাশ ঘটাতে হয়। তবে কম্পিউটার মেমোরির সঙ্গে আমাদের স্মৃতি ব্যবস্থার খুব মৌলিক কতগুলি পার্থক্য রয়েছে। সেগুলো দেখে ফেলা যাক।

কম্পিউটারে মেমোরি থাকে খুবই স্থানীয়ভাবে সংরক্ষিত। এক একটি মেমোরি ইউনিটে সুনির্দিষ্ট তথ্য জমা থাকে- ঐ ইউনিটের বৈদ্যুতিক সার্কিটের গুণই এর জন্য যথেষ্ট। মস্তিষ্কে এক একটি স্মৃতিকে এরকম সুনির্দিষ্ট একটি অংশে স্থানীয়করণ করা যায়না। প্রত্যেক স্মৃতিই নিউরোনের ব্যাপক বর্তনীজালের সামগ্রিক গুণ। বলা যায় প্রত্যেক স্মৃতি মস্তিষ্কে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। কম্পিউটারে মেমোরি বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়া বদলায়না, ব্যবহারের ফলেও বদলায়না। মস্তিষ্কে আমাদের স্মৃতি কিন্তু অনেকটা পরিবর্তনশীল– নিত্য নূতন গড়ছে, বদলাচ্ছে। সৃষ্টির প্রক্রিয়ার দ্বারা এটি যেমন প্রভাবান্বিত হয় তেমনি পরিবেশের দ্বারাও হয়, ব্যবহারের ভঙ্গি বা পৌনপুনিকতার দ্বারাও হয়। কম্পিউটার মেমোরি ইচ্ছেমত সুনির্দিষ্ট স্থানে হস্তক্ষেপ করেই নষ্ট করা যায়। মস্তিষ্কে তা হয় না। এমনকি একটি জায়গায় ক্ষতিগ্রস্থ হলেও পুরো নষ্ট নাও হতে পারে। একই স্মৃতি নানা জায়গায় নানা ভাবে বিস্তৃত থাকে বলে এটি টিকে যায়। মজার ব্যাপার হলো কম্পিউটারের মেমোরির উপর নির্ভর করা যায় বেশি। এর স্মৃতিভ্রম হয়না। মানুষের কিন্তু তা হয়। সুস্থ মানুষেরও প্রায়শ স্মৃতির অনিশ্চয়তা দেখা যায়। মনে করার সময় ভুল ভাবে মনে করতে পারি আমরা, যা কম্পিউটার কখনো করে না।

স্মৃতির নানা রূপঃ স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি

যে সব নানা কাজে আমরা স্মৃতি ব্যবহার করি তার সবটাতে স্মৃতি এক রকমের নয়। এই রকমফেরের মধ্যে সব চেয়ে বেশি স্পষ্ট হলো স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি ও দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির পার্থক্য। পার্থক্যটি স্মৃতিভ্রষ্টদের দেখলে ভাল বুঝা যায়। কোন কোন রোগ বা দুর্ঘটনায় স্বল্পস্থায়ী স্মৃতির কোন ক্ষতি হয়না, কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে পরিণত হবার রাস্তাটি বন্ধ হয়ে যায়। সে অবস্থায় তাদেরকে একটি নাম বা একটি সংখ্যা বল্‌লে তা মনে রেখে একটু পরে বলতে পারে। কিন্তু আধ ঘন্টা আগের কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও তারা হয়তো মনে করতে পারে না, তার চেয়ে পুরানো কিছু তো নয়ই। স্পষ্টত দুটি দুরকমের স্মৃতি। তাদের দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি নষ্ট হলেও স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আবার অন্য দিকে বৃদ্ধ বয়সে আলজাইমার রোগীর স্মৃষ্টিভ্রষ্টতা কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো প্রকৃতির। তারা এই মাত্র খেয়েছে কি খায়নি সে কথাটি মনে রেখে বলতে পারেনা। কিন্তু সুদূর শৈশব বা কৈশোরের অনেক ঘটনা সুন্দর স্মৃতি থেকে বলতে পারে।

প্রথমেই তাই দেখে ফেলা যাক স্বল্পস্থায়ী স্মৃতির প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা কী জানি। স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি চিন্তা প্রক্রিয়ায় অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করে। তথ্যের প্রসেসিং হিসাবে চিন্তার কাজে যে কয়েকটি জিনিস মস্তিষ্কে তথ্যের প্রতিনিধিত্ব করে স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি তার মধ্যে অন্যতম– যেই অর্থে গাছের গুড়ির রিং তার বয়সের তথ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। আসলে স্পল্পস্থায়ী স্মৃতিকে চিন্তার কর্মরত স্মৃতি (ওয়ার্কিং মেমোরি) বলা যেতে পারে– যা অনেকটা শ্লেটে বা টুকরা কাগজে বা কম্পিউটারের স্ক্র্যাচ প্যাডে তাৎক্ষণিক ভাবে সাময়িক কাজে টোকা রাখার মত। অন্যদিকে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি হলো নথিতে সংরক্ষিত রেফারেন্স তথ্যের মত, মাঝে মাঝে প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য মজুদ থাকে। কোন কোন স্বল্পসস্থায়ী স্মৃতিই এরকম দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে পরিণত হয়, কিন্তু সবগুলো হয়না। অধিকাংশই তাৎক্ষণিক কাজ ফুরালেই ভুলে যাই। স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ এটি সাধারণ ছোট ছোট টুকরার আকারেই খুব অল্প সময়ের জন্য কাজে লাগে। যেমন কোন নম্বরে টেলিফোন করার সময় দুটি দুটি বা তিনটি তিনটি করে সংখ্যা আমরা দেখে নিই– কখনো আওড়াতে আওড়াতে বোতাম টিপি, এবং পুরো ডায়ালিং এভাবে সম্পন্ন করি– তারপর ভুলে যাই। স্বল্পস্থায়ী স্মৃতিকে কী ভাবে চিন্তার বা যুক্তির উপাদান হিসাবে ব্যবহার করি তার সুন্দর উদাহরণ পাই অংক করার সময়। যেমন বড় যোগ অংক করার সময় ১৫ এর মধ্যে ৫ বসিয়ে আমরা বলি হাতে রইলো ১। এটি ঐ একটুকু সময় মনে রেখে যৌক্তিক কাজটি সারি, তারপর এটি ভুলে গিয়ে

নূতন অস্থায়ী স্মৃতিতে যাই। এভাবেই প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে মনের মধ্যে ছোট ছোট স্বল্পস্থায়ী স্মৃতির টোকা রেখে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গিয়ে।

স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি আর দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির প্রকৃতি খুবই আলাদা হওয়াতে আন্দাজ করা যায় যে মস্তিষ্কে উভয়ের প্রক্রিয়াটি ভিন্ন হবে। মস্তিষ্কে স্বল্পস্থায়ী স্মৃতির অবস্থানকে সনাক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন পরীক্ষণে মনে হচ্ছে এর অবস্থান কোর্টেক্সে সম্মুখ-পিণ্ডে– বাচন ও মোটর নিয়ন্ত্রণ অংশের ঠিক সামনে যাকে বলা হয় প্রিফন্ট্রাল অংশ। খুব সম্ভব এই স্মৃতির বিষয়টি এখানে স্নায়ু সিগন্যালের একটি ম্যাপের আকারে কিছুক্ষণের জন্য সচল হয়। উদাহরণ স্বরূপ একটি পরীক্ষণে বানরকে তার সামনের কিছু জিনিস লুকিয়ে রাখতে দিলে কোনটি কোথায় লুকিয়েছে তার স্থান অনুযায়ী কোর্টেক্সের ঐ অংশে বিভিন্ন বিন্দু চিহ্নিত করা যায় সেখানকার স্নায়ুর ফায়ারিং লক্ষ্য করে। এ যেন লুকানোর জায়গা মনে রাখার স্বল্পস্থায়ী স্মৃতির একটি ম্যাপ। প্রিফ্রন্টালই যে মস্তিষ্কে স্বল্পস্থায়ী স্মৃতির জায়গা তা আরো বুঝা গেছে বানরের ঐ স্থানটিকে অস্ত্রোপচারে বাদ দিয়ে। স্বাভাবিক ভাবে যে সব স্মৃতি বানর অল্পক্ষণ মনে রাখতে পারে, ঐ অংশ বাদ দেয়া বানর তা কয়েক সেকেণ্ডও মনে রাখতে পারে না। আবার কোন কোন বিজ্ঞানী মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে হিপোক্যাম্পাসেও স্বল্পস্থায়ী স্মৃতির অবস্থান নির্ণয় করেছেন। এখন মনে করা হচ্ছে যে মস্তিষ্কের ম্যাপিংএ স্বল্পস্থায়ী স্মৃতিটি থাকে স্নায়ু সিগন্যালের কিছু লুপ বা বৃত্তাকার বর্তনীর আকারে। এক একটি লুপ এক এক স্বল্পস্থায়ী স্মৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। এতে স্নায়ু ফায়ারিং যেখানে শুরু হয় লুপে ঘুরে আবার সেখানে চলে আসে আবারো ঘোরার জন্য। কিছুক্ষণ এভাবে ফায়ারিংটি লুপে ঘুরে ঘুরে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। তারপর ক্ষীণতর হয়ে লোপ পায়, তখন স্বল্পস্থায়ী স্মৃতিও লোপ পায়। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পাওয়া বাইরের তথ্য থেকে এ স্মৃতি সৃষ্টি হতে পারে, আবার আভ্যন্তরীন কোন যৌক্তিক চিন্তার মধ্যবর্তী তথ্য হিসাবেও এটি হতে পারে। বিশেষ করে একটি প্রারম্ভিক তথ্য থেকে আমরা যখন ধাপে ধাপে যৌক্তিক ভাবে একটি সিদ্ধান্তের দিকে যাই তখন প্রত্যেকটি ধাপ একটি স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি হিসাবে মনে রাখি। অংক করার সময় বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির প্রকারভেদ

দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। কোন কোন বিষয় চিন্তা প্রক্রিয়ার উপর এতখানি দাগ কাটে যে তার স্বল্পস্থায়ী স্মৃতিগুলো দীর্ঘস্থায়ীতে

পরিণত হয়। একবার সেটি হলে তা মস্তিষ্কে দীর্ঘকাল সুপ্ত হিসেবে জমা থেকে যায়– অনেকগুলো সারা জীবনব্যাপী। এর মধ্যে স্মৃতি জাগানিয়া কোন ইশারা ট্রিগারের মত কাজ করে স্মৃতিটিকে মাঝে মধ্যে মনে করিয়ে দিতে পারে। তারপর আবার তা সুপ্ত অবস্থায় ফিরে যায়।

দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির মধ্যেই বেশ কিছু রকমফের রয়েছে যেগুলোর প্রক্রিয়াও একে অপরের চেয়ে ভিন্ন হবার কথা। মোটা দাগে দীর্ঘস্থায়ী সব স্মৃতিকে দক্ষতার স্মৃতি (প্রসিডিউরাল) এবং ব্যক্ত স্মৃতি (ডিকলারেটিভ) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। দক্ষতার স্মৃতিটি বলার জিনিস নয়, করার জিনিস। আমি যদি ছোট বেলায় সাঁতার শিখে থাকি, তা হলে অনেক দিন সাঁতার না কাটলেও পানিতে গেলে আমি সাঁতার কাটতে পারবো, কারণ সাঁতারের দক্ষতাটি কোন ভাবে আমার দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে রয়ে গেছে। স্পষ্টত এ স্মৃতি মস্তিষ্কের ভাষা বা বাচন অংশের সঙ্গে যুক্ত নয়, বরং মোটর অংশের অর্থাৎ নড়াচড়ার অংশের সঙ্গে যুক্ত। অন্যদিকে আমি সাঁতার কাটা সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে পারি এগুলো দীর্ঘদিন মনে রাখতে পারি। সময় সময় এগুলো মনে করে বলতেও পারি। এগুলো সব ব্যক্ত স্মৃতি। দক্ষতার স্মৃতিগুলো বাদ দিলে বাকি প্রায় সবই কোন না কোন ভাবে ব্যক্ত করার উপযুক্ত স্মৃতি।

এই শেষোক্ত স্মৃতির দুটি প্রধান ভাগ রয়েছে– জীবন স্মৃতি (এপিসোডিক) এবং শিক্ষণে প্রাপ্ত স্মৃতি (সেমানটিক)। জীবন স্মৃতি আমার সার্বক্ষণিক ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাগুলোর মাধ্যমে পাওয়া– যা কিনা আত্মজীবনীর একটি চলমান সিনেমার মত, যাতে আমি সব সময় উপস্থিত। আমার জীবনের পদে পদে ছোট বড় নানা ঘটনা এর অংশ– ছোট বেলায় বেড়াতে যাওয়া, পরীক্ষায় ভাল করার আনন্দ, দুর্ঘটনার ভয়াবহ স্মৃতি– সব। যখনই এর কোনটি মনে পড়ে তখন যেন ঐ নিরবিচ্ছিন্ন সিনেমার ঐ অংশটি আবার চালিয়ে দেখা হয়। জীবন স্মৃতির মধ্যে কোন কোন অংশ অবচেতন স্তরে থেকে যায় যা স্পষ্ট মনে পড়েনা, কিন্তু অনুভূতিতে ধরা দেয়। যেমন হেমন্তের প্রথম শিশিরের স্পর্শে কেমন একটি অজানা উদ্বেগ আমাকে শংকিত করে তবে এর কোন কারণ স্পষ্ট হয় না। বিশ্লেষণ করলে তবে বুঝা যাবে এটি হয়তো আমার সুদূর বাল্যকালে বার্ষিক পরীক্ষার মৌসুমের উদ্বেগ। সাধারণত এমন অবচেতন স্মৃতির সঙ্গে ভয় আনন্দ ইত্যাদি আবেগ জড়িয়ে থাকে। জীবনের সব অভিজ্ঞতা অবশ্য জীবন স্মৃতিতে পরিণত হয়ে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে আসেনা। সেগুলোই আসে যাদের কোন না কোন রকম বিশিষ্টতা রয়েছে। ব্যক্ত দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির অন্য প্রধান প্রকার হলো শিক্ষণলব্ধ স্মৃতি। জীবন স্মৃতির মত ইন্দ্রিয় অনুভূতি ভিত্তিক

অভিজ্ঞতার স্মৃতি এরা নয়, বরং নানা ভাবে শিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। অন্যের কাছে শুনে, বই পড়ে, ছবি দেখে বা অন্য কোন ভাবে তা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষণের এই ব্যাপারটি পরস্পর সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে তোলা হয় (এসোসিয়েটিভ)। অভিজ্ঞতালব্ধ বা পরিচিত কোন কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত করে নূতন জ্ঞান লাভ হয় এবং সেভাবে তা স্মৃতিতে থাকে। এক্ষেত্রে রাশিয়ান বিজ্ঞানী পাভলভের কুকুর নিয়ে বিখ্যাত পরীক্ষাটির কথা বেশ প্রাসঙ্গিক। তিনি খাবার আর ঘন্টাধ্বনি এক সঙ্গে কুকুরের কাছে বার বার এনেছিলেন। ফলে এক সময় কুকুর ঘন্টাধ্বনির সঙ্গে খাবারের সম্পর্ক স্থাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এর পর থেকে খাবার না দিয়ে শুধু ঘন্টাধ্বনি করলেই কুকুরের জিহ্বায় লালা আসতো। এরকম বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন শিক্ষণলব্ধ স্মৃতি সৃষ্টিতে সাহায্য করে। মস্তিষ্কে স্মৃতি ধারণের দিক থেকে পাভলভের কুকুরের ঘটনাটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কুকুরের স্মৃতিতে দাগ কাটার জন্য ঘন্টাধ্বনির সৃষ্ট স্নায়ু সিগন্যাল অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রকৃতির। তাই ঘন্টাধ্বনির কারণে কোর্টেক্সে নিউরোন ফায়ার করে না। খাবারের সৃষ্ট স্নায়ু সিগন্যাল কিন্তু যথেষ্ট সবল। খাবার দেখা মাত্র কোর্টেক্সে নিউরোন ফায়ার করে। ঘন্টাধ্বনি ও খাবার উভয়ে এক সঙ্গে বার বার আনার ফলে খাবারের নিউরোন ফায়ারিংএ বলিষ্ঠ হওয়া সিনাপসের জৈব রাসায়নিক প্রভাবে ঘন্টাধ্বনির সৃষ্ট দুর্বল সিনাপ্সও কিছুটা বলিষ্ঠ হয়ে উঠে। এক সময় এটি এত বলিষ্ঠ হয় যে তখন শুধু ঘণ্টাধ্বনিতেই নিউরোন ফায়ার করতে পারে। তখন ঘন্টাধ্বনির জ্ঞানটিই খাবারের স্মৃতি উদ্রেককারী হতে পারে, সত্যিকার খাবারের সাহায্য ছাড়াই।

মস্তিষ্কে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির স্বরূপ

খাবার আর ঘন্টাধ্বনির কারণে কুকুরের মস্তিষ্কে সবল আর দুর্বল স্নায়ু সিগন্যাল তৈরির বিষয়টি আমরা দেখেছি। সিগন্যালের সবলতার সঙ্গে স্নায়ুতন্তুর অদ্ভূত একটি সম্পর্ক হলো এর মধ্য দিয়ে যতই সবল সিগন্যাল প্রবাহিত হবে ততই তার সিনাপ্স বলিষ্ঠতর হতে থাকবে এবং তা স্থায়ীভাবেই হবে। একে বলা হয় স্নায়ুতন্তুর সক্ষমতা বৃদ্ধি। সবল ও ঘন ঘন সিগন্যাল এরকম দীর্ঘস্থায়ী সক্ষমতা সৃষ্টি করে (লং টার্ম পোটেনশিয়েশন)। স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি রূপে যে স্নায়ুতে সবল ও ঘন ঘন বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে থাকে এর ফলে তার বর্তনীর সংশ্লিষ্ট সিনাপ্সগুলোতে দীর্ঘস্থায়ী সক্ষমতা সৃষ্টি হয়– যাকে আমরা বলিষ্ঠকরণ বলেছি। সিগন্যাল সবলতার ফলে সিনাপ্সে নূতন নূতন আরো প্রোটিন সৃষ্টি

হয়ে এই অধিকতর বলিষ্ঠতার সৃষ্টি হয়। এখন স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি শেষ হয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলেও সিনাপ্সের ঐ বলিষ্ঠতা বজায় থাকে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে। ঐ বলিষ্ঠ সিনাপ্সই দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির ধারক। আসলে এক একটি স্মৃতি শুধু এক সারি সিনাপসের বলিষ্ঠকরণ নয়, বরং নানা শাখা প্রশাখায় বর্তনী জালের রূপে এরকম বলিষ্ঠকৃত সিনাপ্সের এক একটি প্যাটার্ন। স্বল্পস্থায়ী স্মৃতিকে চলমান বিদ্যুৎ বহনকারী বর্তনী মনে করা যায়– কাজেই তার অস্থিত্ব স্থান আর কাল উভয়েই। দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে পরিণত হবার পর স্নায়ুর বতর্নী জাল থাকে, কিন্তু তাতে বিদ্যুৎ থাকেনা। কাজেই এর অস্থিত্ব শুধু স্থানে, বিদ্যুতের চলমানতা নাই বলে কালের সঙ্গে এর কোন পরিবর্তন নাই। এর তুলনা তাই করা যায় একটি টেইপ, অথবা সিডি কিংবা ডিভিডির সঙ্গে– যেখানে নিশ্চল স্মৃতি জমা থাকে দীর্ঘকালের জন্য। যখন ঐ স্মৃতিকে আমরা স্মরণে আনি তখন পুনরায় কিছুক্ষণের জন্য এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। সিনাপ্স বলিষ্ঠতার প্যাটার্ন অনুসরণ করে তখন ঐ পুরানো স্বল্পস্থায়ী স্মৃতির ঘটনাগুলো চিন্তায় আবার দেখা দেয়। দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির স্বরূপ সম্পর্কে বর্তমানে এরকম তত্ত্বই মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। এখানে বিদ্যুৎ বর্তনীর সঙ্গে তুলনার সময় একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। সাধারণ বিদ্যুৎ বর্তনীতে বিদ্যুৎ প্রবাহ যতই জোরালো হোক না কেন বা তা যতই ঘন ঘন হোক না কেন, তা বর্তনীকে অধিকতর সুগম বা বলিষ্ঠ করে তুলতে পারবেনা, বড় জোর পুড়ে নষ্ট করে দিতে পারবে। কিন্তু মস্তিষ্কে স্নায়ুর গুণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে সবল প্রবাহ বর্তনীকেই বদলে দেয়– তাকে বলিষ্ঠ করে। মস্তিষ্কের সেই অদ্ভূত নমনীয়তার আর পরিবর্তনশীলতার গুণ এখানে চমৎকারভাবে দেখা যায়।

স্থায়ীস্মৃতি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বটি আমরা দেখলাম। এখন দেখা যাক এটি কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। পাভলভের কুকুরের ঘন্টার দুর্বল স্নায়ু সিগন্যাল খাবারের সবল সিগন্যালের সাহচর্যে জোরালো হয়ে উঠার তত্ত্বটি দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী হেব, ১৯৪৯ সালে। তার বহুদিন পর হেবের এই তত্ত্ব চমৎকার এক পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে ২০০০ সালে শারীরবিদ্যায় নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন বিজ্ঞানী ক্যান্ডেল। তিনি পরীক্ষার জন্য বেছে নিয়েছিলেন এপ্লাইসিয়া নামের খোলসবিহীন এক সামুদ্রিক শামুক। এর সুবিধা হলো মস্তিষ্কবান প্রাণির মত এর স্নায়ুর বেশি জটিলতা নাই। এর রয়েছে কয়েকটি মাত্র স্নায়ু কোষ, আর স্পর্শ করে উত্তেজিত করলেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের ফুলকা গুটিয়ে নিয়ে এটি স্পষ্ট সাড়া দেয়। দ্রুত বার বার স্পর্শ করে অভ্যস্ত করে ফেল্লে এই সাড়া কমে যায়– যাকে বলা হয় হ্যাবিচুয়েশন বা অভ্যস্তকরণ।

তবে স্পর্শটি খুব অপ্রিয় রকমের জোরদার হলে ঐ অভ্যস্তকরণ খাটেনা, তখন তার কড়া সাড়াটি বজায় থাকে– যাকে বলা হয় সেনসিটাইজেশন বা সংবেদিকরণ। এই বিষয়গুলোকে প্রাণির শিক্ষণ পদ্ধতি বুঝতে গিয়ে আমরা পরে আবার দেখবো। এখানে যা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো ক্যান্ডেল একই সঙ্গে সূক্ষ্ম মাপজোকের মাধ্যমে শামুকের স্নায়ুর সিনাপ্‌স বলিষ্ঠতাগুলো পরিমাপও করছিলেন। এতে দেখা গেছে স্নায়ুতে দুর্বল ও সবল সাড়াগুলো সিনাপসকে ঠিক সেভাবেই বলিষ্ঠ করেছে যেভাবে হেবের তত্ত্ব বলেছে।

ইতোমধ্যে আরো নানা পরীক্ষণে ব্যাপারটির আরো প্রমাণ পাওয়া গেছে। যেমন নানা প্রাণির দর্শন কোর্টেক্সে দৃষ্টি সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে দেখা গেছে এর ফলে তার স্নায়ুর সিনাপসের নানা অংশে স্পষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। মুরগির উপর কতগুলো সুন্দর পরীক্ষা হয়েছে। মুরগির বাচ্চা সব কিছুকে ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে গ্রহণযোগ্য খাদ্য সম্পর্কে শেখে– বিস্বাদ কিছু পেলে তা মনে রাখে এবং ভবিষ্যতে তাকে এড়িয়ে যায়। যখন এমনটি ঘটে তখন ঐ মুরগি বাচ্চার মস্তিষ্কে অনেক রকম পরির্বতন পরিমাপে ধরা পড়েছে। এতে তখন এমন কিছু এনজাইম তৈরি হয় যা সিনাপ্‌সের সিগন্যাল পরিবহন ক্ষমতায় পরির্বতন আনতে পারে এবং এমন কিছু গ্লাইকোপ্রোটিন সৃষ্টি হয় যা সিনাপসে চলে যেতে ও গৃহীত হতে পারে। শুধু তাই নয় ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে স্পষ্ট দেখা গেছে যে সিনাপসের আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে। কিছু সময় পরে মুরগিটির মস্তিষ্কের সামনের অংশের নিউরোন ফায়ারিং ক্ষমতায়ও পরিবর্তন ধরা পড়ে। অথচ বিস্বাদ বস্তুর ঘটনা না ঘটলে অথবা ঐ বিস্বাদ বস্তুর কথা সঙ্গে সঙ্গে ভুলিয়ে দিলে, অথবা মস্তিষ্কের সামনের অংশ অস্ত্রোপচার করে বাদ দিলে– এসব কিছুই দেখা যায় না। স্পষ্টত দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির সঙ্গেই সিনাপ্‌সের এসব পরিবর্তন সম্পর্কিত। এই সবকিছুই ইঙ্গিত করছে যে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি নিউরোনের সঙ্গে অন্য নিউরোনের নানা সিনা্পস সংযোগের বলিষ্ঠতার প্যাটার্ন হিসাবেই জমা থাকে। ২০০৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা সামুদ্রিক নরোম শামুকের সরল স্নায়ু ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে এটি প্রমাণ করেছেন। একে একটি উদ্দীপক দিয়ে তার স্মৃতি সিনাপ্‌সে নূতন প্রোটিন হিসাবে জমা সে জমা হয় তা তাঁরা দেখিয়েছেন। কিছু পরীক্ষায় দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির অবস্থানটি মস্তিষ্কের সামনে অংশে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আরো কিছু পরীক্ষা দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির সঙ্গে কোর্টেক্সের নিচে মস্তিষ্কের ভেতরের দিকে হিপোক্যাম্পাসকে দায়ী করছে। স্তন্যপায়ীর মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাসকে পাতলা পাতলা স্লাইজ করে তার একটি স্লাইজের উপর পরীক্ষা করা হয়েছে। এর উপর উত্তেজক বৈদ্যুতিক শক্‌ দিলে এর

নিউরোনের বিদ্যুৎ পরিবহনে পরিবর্তন ঘটে এবং তা বেশ অনেক ঘন্টা ওভাবেই বজায় থাকে। পরে জীবন্ত প্রাণির হিপোক্যাম্পাসের উপর অনুরূপ পরীক্ষণে একই রকম ফলাফল পাওয়া গেছে। এ ভাবে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি হিপোক্যাম্পাসে জমা থাকার আভাস পাওয়া গেছে যা পরে অন্যান্য পরীক্ষায়ও দেখা গেছে। কিছু কিছু বিরল ক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় বা রোগে রোগী জীবন স্মৃতি ভুলে গেছে অথচ শিক্ষণ লব্ধ স্মৃতি রয়ে গেছে এমনটি দেখা যায়। এমন রোগীর মস্তিষ্কের এম আর আই ইমেজ বিশ্লেষণে মনে হচ্ছে জীবন স্মৃতির নিউরোন প্যাটার্নগুলো হিপোক্যাম্পাস কেন্দ্রিক, কিন্তু শিক্ষণলব্ধ স্মৃতির নিউরোন প্যাট্যার্নগুলো কোর্টেক্সের সম্মুখ ভাগ কেন্দ্রিক।

যে সব স্মৃতির সঙ্গে ভীতি অথবা অন্য কোন তীব্র আবেগ জড়িত, সেগুলো মস্তিষ্কে একটু বিশেষ গুরুত্ব পায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে মস্তিষ্কের ছোট বাদাম সদৃশ এমিগডালায় এরকম স্মৃতি বেশ গভীর ভাবে অঙ্কিত থাকে। ২০০৯ সালের একটি পরীক্ষণে খুবই ভীতিপ্রদ একটি আওয়াজের স্মৃতি ইঁদুরের এমিগডালায় কোন্ নিউরোনগুলোকে বলিষ্ঠ করেছে তা সনাক্ত করা গেছে। পরে ঐ নিউরোনগুলো নষ্ট করে ঐ ভীতির স্মৃতি মুছে দেয়া সম্ভব হয়েছে। এই প্রথম এমন সুনির্দিষ্ট সনাক্তকরণ সম্ভব হলো।

আসলে একটি দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি মস্তিষ্কের কোথাও বিশেষ একটি জায়গায় স্থানীয়কৃত হয়ে আছে এমনটি সব সময় বলা যাবেনা। মনে হয় এটি মস্তিষ্কের নানা জায়গায় কিছুটা ছড়ানো থাকে। কম্পিউটার মেমোরির সঙ্গে এটি যে একটি বড় পার্থক্য তা আগেই দেখেছি। এজন্য মস্তিষ্কের কোন একটি অংশ নষ্ট হয়ে গেলেই সব স্মৃতি পুরাপুরি নষ্ট নাও হতে পারে। যেমন বানরের ক্ষেত্রে পুরো কোর্টেক্স বাদ দিয়েও দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি শুধু কমতে দেখা গেছে, পুরাপুরি বিলুপ্ত হতে নয়। কিন্তু স্মৃতি স্থানীয়কৃত হবার বিষয়টিকেও একদম বাদ দেয়া যাচ্ছে না। যেমন কোন কিছু অনুধাবনের স্মৃতি মস্তিষ্কে এ অনুধাবনটির জন্য দায়ী অংশের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। আমাদের চোখ বা দর্শন প্রক্রিয়ার অন্যান্য অংশ নষ্ট হলে আমরা আর দেখতে পাইনা। কিন্তু পূর্বের দেখার স্মৃতি এ কারণে ভুলিনা। কিন্তু দর্শন কোর্টেক্সটি নষ্ট হলে দেখা মানে যে কী সেই বোধটুকুর স্মৃতি পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়।

স্মৃতি থেকে মনে করা

স্মৃতিকে মনে করতে হলে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির নিউরোন বর্তনী জালের প্যাটার্নের মধ্য দিয়ে সেই পুরানো সিগন্যাল আবার চালু করতে হবে। এভাবে চালু করার

জন্য সেই স্মৃতি জাগানিয়া একটি ইশারার প্রয়োজন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ইশারার মধ্যে আবেগের উপস্থিতি থাকে। ইশারাটি কোন দৃশ্যের আকারে আসতে পারে– যেমন কাছাকাছি চেহারার কাউকে দেখে অতীতের কাউকে মনে পড়ে যাওয়া। এটি শব্দের আকারে আসতে পারে– পুরানো দিনের গান শুনে ঐ আমলের কোন স্মৃতি মনে পড়া। এমনকি এটি গন্ধও হতে পারে– যেমন বহুদিন পর হঠাৎ পাট পঁচা গন্ধ পেয়ে গ্রামে বাল্য কালের কোন স্মৃতি মনে পড়া। অনেক সময় ইশারাকে কার্যকর হতে এর নানা উপাদানকে নানা গুণ নিয়ে এক সঙ্গে সক্রিয় হতে হয়। এগুলোর প্রত্যেকটি যার যার নিজস্ব গুরুত্ব নিয়ে একত্র হয়ে যখন সুসংবদ্ধ হয় তখনই স্মৃতির সিগন্যালটি ট্রিগার হতে পারে। জীবনান্দ দাসের পল্লী স্মৃতির ট্রিগার করে কলমি শাকের অনুভূতি– 'সারা দিন কেটে যাবে কলমির গন্ধে ভরা জলে ভেসে ভেসে'। এ অনুভূতির মধ্যে হয়তো রয়েছে গন্ধ ছাড়াও কলমির সবুজ হওয়া, নরোম হওয়া, ভেজা হওয়া ইত্যাদি গুণ। এক্ষেত্রে হয়তো গন্ধটির গুরুত্ব বেশি, সবুজের বা নরোমের বা ভেজার গুরুত্বও বিশেষ বিশেষ পরিমাণে। সব ক'টি যখন একত্রে যার যার গুরুত্ব নিয়ে সুসংবদ্ধ হয়ে যায় তখনই স্মৃতি জাগানিয়া ইশারাটি কার্যকর হয়। কলমির এই একই উপাদানগুলো অন্য রকম নানা গুরুত্ব নিয়ে একত্র হয়ে হয়তো অন্য একটি স্মৃতির জন্য ইশারা হিসাবে কাজ করবে।

এভাবে স্মৃতি মনে পড়ার ইশারা হিসাবে নানা উপাদানের মিশ্রণ ব্যবহৃত হবার কিছু সুবিধা রয়েছে। একটি তো আমরা দেখলাম যে একই উপাদাগুলোর নানা গুরুত্বের নানা মিশ্রণ বিভিন্ন স্মৃতির জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। আর একটি হলো একাধিক উপাদান থাকাতে কোনটি বাদ পড়লেও স্মৃতি জাগতে অসুবিধা হয়না– যদি শুধু কলমির গন্ধে আর সবুজেই কাজ চলে নরোম আর ভেজা হওয়াটির উপাদান ওগুলো থেকেই পাওয়া যাবে। স্মৃতির ক্ষেত্রে সব সময় প্রয়োজনের চেয়ে বাড়তি কিছু নিউরোন প্যাটার্ন মজুদ থাকে। ফলে ইশারাটি সীমিত দিক থেকে আসলেও হয়তো এতে সিগন্যালের ফায়ারিং শুরু হয়ে যেতে পারে। স্মৃতিকে মনে করার প্রক্রিয়াটিকে দুভাগে ভাগ করা যায়– একটি হলো স্মৃতিতে থাকা তথ্যগুলোকে পুনরুদ্ধার করা, আর অন্যটি হলো স্মৃতি থেকে অতীতের কিছুকে চিনতে পারা। তথ্য উদ্ধার আর চিনতে পারা একই জিনিস নয়। তথ্যের ব্যাপারে তার আলাদা আলাদা খুঁটিনাটিগুলো রয়েছে। কিন্তু চেনার ব্যাপারটি সবকিছুর একত্রে একটি ছবির মত– ওটি দেখামাত্র হয় চিনতে পারলাম, নয় পারলামনা।

তথ্য পুনরুদ্ধারের কাজটি সহজ হয় যদি তথ্যগুলো কোন কাঠামো অনুযায়ী সাজানো থাকে বা সাজিয়ে নেয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ কাঠামোটি হতে পারে একটি ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে, যেমন বর্ণমালার ধারাবাহিকতায়– 'ক' বল্‌লে 'খ' অনায়াসে মনে পড়ে, তারপর 'গ'। এই ধারাবাহিকতার সুবিধা থাকে বলেই কোন কবিতা মাঝখানে ভুলে গেলে আবার প্রথম থেকে আওড়িয়ে গেলে মনে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। আর এক রকম কাঠামো হতে পারে ধাপে ধাপে শ্রেণী বিভাজনের মাধ্যমে। যেমন সবগুলো উপজেলার নাম মনে করে বলা কঠিন, কিন্তু যদি বিভিন্ন বিভাগের একটি একটি নিয়ে সেটির জেলাগুলো মনে করি। আর সেই জেলাগুলো একটি একটি নিয়ে তার উপজেলাগুলো মনে করি তাহলে মনে করা সহজ হয়– ঐ কাঠামোর কল্যাণে। আর এক রকম কাঠামো হতে পারে স্থানিক অক্ষের কাঠামো– যেমন ম্যাপে কোন কিছুর উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে বা পশ্চিম কী আছে সেই হিসাবে জায়গাগুলো মনে করা সহজ।

এছাড়া মনে করার জন্য চিনতে পারার দিকটিও রয়েছে। সেটি কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় ভাবেই কাজ করে– কাউকে দেখলাম তো সঙ্গে সঙ্গে কোথায় একটি সংযোগ হয়ে গেল, মনে পড়ে গেল সে কে। তবে এভাবে চিনতে পারার সম্ভাবনাটি বেড়ে যায় অতীতে তার সঙ্গে মেলামেশা বেশি হয়ে থাকলে। এমনি ভাবে কোন কবিতা বা নাটকের কোন সংলাপ মনে পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় তা যদি আগে বার বার পুনরাবৃত্তি করে পড়া হয়ে থাকে, কিংবা বার বার মহড়া দেয়া হয়ে থাকে। এখানে মনে পড়াটি কিন্তু তথ্য পুনরুদ্ধারের কারণে সহজ হচ্ছে না, চিনতে সুবিধা হবার জন্যই সহজ হচ্ছে।

তথ্য পুনরুদ্ধার এবং চিনতে পারা এই উভয় দিক থেকে স্মৃতি মনে পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় যদি স্মৃতিটি তৈরি হবার সময় তা অর্থপূর্ণভাবে অনুধাবনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। বুঝে বুঝে পড়লে সব সময় মনে থাকবে, না বুঝে মুখস্ত করলে মনে থাকার সম্ভাবনা কমে যাবে– এ কথা কিন্তু খুবই খাঁটি। তথ্যগুলোর পেছনে সেরকম কোন যুক্তি বা অর্থ যদি না থাকে তা হলে তা মনে রাখা কঠিন হতে পারে। এই অসুবিধার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা অনেক সময় এর একটি কৃত্রিম অর্থ দাঁড় করাই, অর্থাৎ কিনা কৃত্রিম ভাবে হলেও কিছু নিয়মের অপরিহার্যতা এর জন্য সৃষ্টি করি। ছন্দোবদ্ধ একটি ছড়ার আকারে নিয়ে এসে একাজ হতে পারে- যেমন ইংরাজি কোন মাসে কত দিন মনে রাখতে– 'তিরিশ দিনেতে হয় মাস সেপ্টেম্বর, এই রূপ এপ্রিল আর জুন নভেম্বর'। অথবা মুঠ করা হাতের আঙ্গুলের গাঁটগুণে গুণেও আমরা একই রকম একটি কৃত্রিম অর্থের

সৃষ্টি করি ঐ একই জিনিস মনে রাখতে। কিন্তু কৃত্রিম অর্থের বদলে সত্যিকার অর্থ থাকলে এবং তার অনুধাবন করেই স্মৃতিতে রাখলে মনে করা সব চেয়ে সহজ হয়। চিনতে পারার জন্য যে সার্বিক চিত্র সেটিও অনুধাবনে যত বেশি জাজ্বল্যমান হবে চেনার জন্য তত ভাল। মস্তিষ্কের সিনাপ্স বলিষ্ঠতার প্যাটার্ন হিসাবে যেই স্মৃতি জমা থাকে তার অন্তর্নিহিত অর্থ থেকে ইশারা পেয়েই তার মধ্যে আবার বিদ্যুৎ প্রবাহ চালু হওয়ার সম্ভাবনাটি সব চেয়ে বেশি।

যখন ভুলে যাই

চেষ্টা সত্ত্বেও কোন স্মৃতি যদি মনে না করতে পারি তা হলে একাধিক কারণে তা হতে পারে। প্রথমত স্মৃতিটি এখনো মস্তিষ্কে আদৌ আছে কিনা সেটিই বিবেচ্য। নানা কারণে মস্তিষ্কে জমা স্মৃতির স্নায়ু প্যাটার্নটি অবক্ষয়িত হয়ে যেতে পারে। যেমন আরো গুরুত্বপূর্ণ অথচ আগেরটির অনেকটা অনুরূপ অন্য কোন স্মৃতি আসলে ওটিই আগেরটির জায়গা দখল করে আগেরটিকে নষ্ট করে দিতে পারে। এটি আগের স্মৃতির স্নায়ু প্যাটার্নগুলো বুজে দিয়েই সম্ভব। কিন্তু ঠিক তাই হয়েছে কিনা তা কোন ভাবে ঐ স্নায়ু প্যাটার্নগুলো সত্যি সত্যি দেখা ছাড়া জানার উপায় নাই। কারণ যদি স্মৃতি মস্তিষ্কে বজায়ও থাকে তবুও একে পুনরুদ্ধারের ব্যর্থতার ফলেও তা মনে না পড়তে পারে। যেমন আমার খুব পরিচিত কাউকে হঠাৎ রাস্তায় দেখলাম– কিন্তু কিছুতেই তাঁর নাম মনে করতে পারছিনা, অথবা কী ভাবে তিনি আমার পরিচিত সেই কথাটিও মনে করতে পারছিনা। আমি বেশ জানি যে তিনি আমার স্মৃতিতে আছেন এবং তাঁর নামও সেখানে আছে। কিন্তু কোন ভাবেই এ মুহূর্তে তা মনে করতে পারছিনা। প্রায় ক্ষেত্রে এটি ঘটে সঠিক ইশারা বা ট্রিগারের অভাবে। পরে সে রকম ইশারা খুঁজে পেলে এটি মনে পড়তেও পারে। এজন্য কোন্ স্মৃতি একেবারেই মুছে গিয়েছে, কোন্টি শুধু পুনরুদ্ধারের সমস্যা সেটি জানা কঠিন।

তৃতীয় আরো এক ভাবে ভুলে যেতে পারি। এটিও সেই ইশারার ব্যাপার। এক্ষেত্রে ইশারাও রয়েছে কিন্তু তা ঐ স্মৃতিটি ছাড়া আরো অন্যান্য স্মৃতিরও ইশারার কাজ করে এটি, তাই সুনির্দিষ্ট করে এই স্মৃতি পুনরুদ্ধারে তা সহায়ক নয়। যেমন বিশেষ কোন পোষাক কারো কথা মনে করিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সেই একই পোষাক যদি আরো কয়েকজনের কথা মনে করাতে পারে তখন ঐ ইশারার আর তেমন কার্যকারিতা থাকে না।

স্মৃতি পুনরুদ্ধারের সমস্যার বিষয়টি আমাদের কাছে অধিক স্পষ্ট হলেও কোন কোন স্মৃতি যে চিরতরে মস্তিষ্ক থেকে লোপ পায় সেটি নিশ্চিত। সময়ের সঙ্গে

তা ধরা পড়ে। রোগ বা দুর্ঘটনার কারণে অন্তত আংশিক ভাবে তা ঘটতে পারে, অন্য ভাবেও পারে। সব স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি যে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে পরিণত হয়না স্মৃতি পুনরূদ্ধারের দিক থেকে সেটি ভাল। স্মৃতির পরিমাণ অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়লে, মস্তিস্কে তার জায়গা হয়তো হতো, কিন্তু পুনরুদ্ধারের জটিলতা যে প্রায় অসম্ভব পর্যায়ে চলে যেত সেটি নিশ্চিত।

কম্পিউটারের 'ইরেজ বাটন' আছে যা টিপলে ঐ মেমোরি মুহূর্তে লোপ পায়। অনেক কিছুকে এক সঙ্গেও ইরেজ করা যায় সেখানে মুহূর্তের মধ্যে। আমাদের কিন্তু 'ইরেজ' বাটন নাই, ইচ্ছে করলেই আমরা কোন কিছু ভুলতে পারিনা। এতে সুবিধা যেমন হয় অসুবিধার পরিমাণও নেহাত কম নয়।

স্মৃতি থেকে স্বপ্ন

স্মৃতির অসম্পূর্ণ, অনেক ক্ষেত্রে অসংলগ্ন, বহিপ্রকাশ ঘটে স্বপ্নে। অবশ্য স্বপ্ন দেখার আগে কাছাকাছি সময়ে জাগ্রত অবস্থার চিন্তার সঙ্গেও তার একটি ধারাবাহিকতা থাকে সাধারণত। এরকম কোন চিন্তাই হয়তো স্বপ্নটির ট্রিগার হিসাবে কাজ করতে পারে। স্বপ্নের মধ্যে যে ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে যাই– সেগুলোর অধিকাংশই আসে জীবন স্মৃতি থেকে। তবে আবার তার কিছু কিছু শিক্ষণ-লব্ধ স্মৃতি অথবা অবচেতন চিন্তা থেকেও আসতে পারে। কোনটি কী পরিস্থিতিতে কতখানি আসবে এর কোন প্রতিষ্ঠিত শারীর বৃত্তীয় তত্ত্ব এখনো আমাদের হাতে নাই, যদিও এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা চলছে। স্বপ্নে দেখা অনেক কিছু অসংলগ্ন ও অযৌক্তিক হবার কারণ হলো মস্তিস্কের কোর্টেক্সে উচ্চতর পর্যায়ে সব চিন্তার উপর যুক্তি ও বস্তুনিষ্ঠতার যাচাইয়ে যে খবরদারি থাকে স্বপ্নের ক্ষেত্রে তার অভাব ঘটে। ফলে প্রায়শ স্মৃতিগুলো যথাযথভাবে এতে আসতে পারে না।

ঘুমের সব পর্যায়ে আমরা স্বপ্ন দেখিনা, অন্তত দীর্ঘ ও বিস্তারিত স্বপ্ন দেখিনা। সাধারণত ঘুমের কয়েকটি পর্যায় পর পর আসে। প্রথমে হালকা ঘুম, তারপর গভীর ঘুম। তারও পরে একটি পর্যায় রয়েছে যাকে বলা হয় রেম পর্যায় (REM)– র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট অর্থাৎ দ্রুত চোখের সঞ্চালন। ঘুমের মধ্যে চোখের মণিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এই পর্যায়ের ঘুমের সময় এটি দ্রুত নড়াচাড়া হতে থাকে। এ সময় মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ বেশ সক্রিয় হয়ে উঠে এবং তার ফলে এরকম ঘুমের পর্যায়ে আমরা দীর্ঘ স্বপ্নগুলো দেখে থাকি। ঠিক এ সময় ঘুম ভাঙ্গলে কিছুক্ষণ সে সব স্বপ্নের কথা বেশ মনেও

থাকে, বিস্তারিত বলা যায়। তবে দেখার পর স্বপ্নের বিষয়টি কিন্তু স্মৃতির মধ্যে ভাল ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পায়না। তাই বেশিক্ষণ এর কথা ভাল ভাবে মনে রাখা সম্ভব হয়না, ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

স্বপ্ন নিয়ে আধুনিক ধারণার অনেকখানি এসেছে রেম সম্পর্কিত গবেষণার থেকে। আধুনিক মস্তিষ্ক ইমেজ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে রেম পর্যায়ের ঘুমের সময় যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে উঠে মস্তিষ্কের দুটি অংশ– কোর্টেক্সের পার্শ্ব-পিণ্ড এবং কোর্টেক্স বহির্ভূত এমিগডালা। প্রথমটিতে দর্শনলব্ধ স্মৃতিগুলো জমা থাকে বেশি, আর দ্বিতীয়টি আবেগের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত (যা আমরা পরে দেখবো)। এর থেকে বুঝা যায় স্মৃতির মধ্যে অতীতের দেখা থেকে সে সব ইমেজ জমা হয়ে আছে তার সঙ্গে অবচেতন আবেগ মিশ্রিত চিন্তার একটি মিশেল ঘটিয়ে স্বপ্ন তৈরি হয়। মস্তিস্কের যে প্রিফন্ট্রাল কোর্টেক্স এর উপর যুক্তির খবরদারিটা করতে পারতো সেই অংশ কিন্তু এই ঘুমের মধ্যে সক্রিয় থাকেনা। জাগ্রত অবস্থায় এই প্রি-ফ্রন্টাল কোর্টেক্সই চিন্তার যৌক্তিক ছাকনির কাজটি করে থাকে। তাই স্বপ্নে আমরা দেখি তার অনেক খানিকেই পরে যুক্তির ধোপে টেকাতে পারিনা। বহুদিন আগে সিগমন্ড ফ্রয়েড স্বপ্নের মধ্যে অবচেতন ইচ্ছার প্রকাশকে মুখ্য করে স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন স্বপ্নের মধ্যে মস্তিষ্কের আবেগের অংশ এমগ্ডিালার সক্রিয়তা তারই আধুনিকতর সাক্ষ্য বহন করছে।

দিবাস্বপ্ন অলস মস্তিস্কের কাজ, তবে গুরুত্বপূর্ণ

কমবেশি সবাই দিবাস্বপ্নের মধ্যে চিন্তার রাশ ছেড়ে দেন। চিন্তার ঘুড়ি উড়তে থাকে এদিক ওদিক– কিন্তু তার অনেকখানিই নিজের স্মৃতির রোমন্থনে ও ভবিষ্যতের লাগামছাড়া কল্পনায়। কোন বিশেষ চিন্তায় ব্যস্ত না থাকলে মস্তিস্ক অলস ভাবে দিবাস্বপ্নের দিকে চলে যায়। অতি সাম্প্রতিক গবেষণায়ও সাক্ষ্য প্রমাণসহ এ কথাটিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পি ই টি এবং এম আর আই ইমেজিং এর মাধ্যমে দিবাস্বপ্নের প্রক্রিয়া ও কাজ নিয়ে বেশ কিছু এভাবে জানা গেছে। এতে দেখা গেছে যে মস্তিস্কের একটি অংশ রয়েছে যা মনোযোগী অবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকে– ইমেজের মধ্যে এ অংশ আঁধার হয়ে থাকে। কিন্তু কোন বিশেষ কিছুর দিকে মনোযোগ আর না থাকলে যেই মাত্র মনোসংযোগ বিচ্ছিন্ন হলো তখন ঐ অংশটি জ্বলে উঠে– অর্থাৎ এক ধরনের স্নায়ু ফায়ারিং ওখানে শুরু হয়ে যায়। এই অংশটিই দিবা- স্বপ্নের জন্য দায়ী। এটি নেভানো থাকা অবস্থায় দিবাস্বপ্ন থাকে না। কিন্তু কোন কিছুর দিকে মনোযোগ না থাকলে মস্তিষ্কের এই অংশ যখন উদ্দীপ্ত হয় তখন দিবাস্বপ্ন আরম্ভ হয়। মস্তিস্কের এই অংশটি

গড়া প্রি-ফ্রন্টাল আর হিপোক্যাম্পাসের অংশ বিশেষ নিয়ে- যার উভয়েই স্মৃতির অধিষ্ঠান। কাজেই স্পষ্টত দিবাস্বপ্ন স্মৃতিকে ঘিরে গড়া, অনেকাংশে স্মৃতিরই জাবর কাটা।

যদিও এভাবে আধুনিক ইমেজিং পদ্ধতিও বলছে যে দিবাস্বপ্ন অলস মস্তিস্কের কাজ, এ গবেষণাই আবার প্রমাণ করছে যে তা সত্ত্বেও দিবা স্বপ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এটি শুধু স্মৃতির জাবর কাটাই নয় বরং স্মৃতি থেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নেবার প্রক্রিয়াও বটে। ঐ দিবাস্বপ্নের মধ্যেই থাকে ভবিষ্যত পরিকল্পনার একটি নিত্য উপাদান। দিবাস্বপ্ন নিজে আঁটঘাট বাঁধা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নয় বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য এটি এক ধরনের আভ্যন্তরীন রিহার্সেল। তাই দিবা- স্বপ্ন নূতন আইডিয়া, সৃজনশীলতা, নূতন কর্ম পরিকল্পনায় সহায়ক হয়ে থাকে– যদিও তার অনেকখানি পুরানো স্মৃতি রোমন্থনের ভিত্তিতেই ঘটে।

আমাদের বহু পরিচিত সেই গোয়ালিনির গল্পটি আমরা নেতিবাচক হিসাবে নিতে অভ্যস্ত। মাটির হাঁড়ি ভর্তি দুধ মাথায় করে বাজারের দিকে হাঁটতে হাঁটতে গোয়ালিনি দিবাস্বপ্নে বিভোর ছিল যে এ দুধ বেচে টাকা জমিয়ে একদিন সে বড় ডেইরি ফার্ম করে বড়লোক হবে। এমন সময় অমনোযোগের কারণে হোঁচট খেয়ে সে বরং তার সবে ধন দুধ আর হাঁড়িটুকুই হারিয়েছে। বিজ্ঞানীরা বরং বলছেন এই দিবাস্বপ্নগুলোই গোয়ালিনির মত সবাইকে সত্যি সঠিক কাজে পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করে, এবং স্বপ্নপূরণের কিছুটা সম্ভাবনা এনে দেয়।

ঘুমের মধ্যে দেখা স্বপ্নের সঙ্গে দিবাস্বপ্নের কি কোন সম্পর্ক আছে? না সেরকম কোন সম্পর্ক গবেষণায় দেখা যায়নি, তবে দিবাস্বপ্নের জন্য দায়ী মস্তিষ্কের অংশটির অন্য রকম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ঘুমের মধ্যেও রয়েছে। এম আর আই ইমেজ থেকে দেখা গেছে যে, ঘুমের সময় ঐ অংশ থেকে ধীর গতির স্নায়ু তরঙ্গ ক্রমাগত মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যোগাযোগ করে। বিশেষ করে হিপোক্যাম্পাসের সঙ্গে তাকে সর্বক্ষণ আদান প্রদান করতে দেখা যায়। আর এই হিপোক্যাম্পাস হচ্ছে স্থায়ী স্মৃতির একটি আধার। এর থেকে মনে হয় যে ঘুমের অলস সময়ের সুযোগ নিয়ে দিবাস্বপ্নের জন্য দায়ী ঐ অংশ সঞ্চিত স্থায়ী স্মৃতিগুলোকে গোছগাছ করে রাখতে এবং অপ্রয়োজনীয় অংশগুলোকে বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় অংশগুলোকে জোরালো করে সংরক্ষণ করতে সাহায্য করে। এটি ভাল বুঝা যাচ্ছে এই সময় অংশটির গ্লুকোজ ব্যয়ের ভঙ্গি দেখে। দেখা যাচ্ছে যে ঘুমের মধ্যে এটি বিপুল পরিমাণ গ্লুকোজ ব্যয় করছে কিন্তু অক্সিজেন

ব্যবহার করছে খুব কম। এতে বুঝা যাচ্ছে এই গ্লুকোজকে এটি পুড়ছেনা বরং এমাইনো এসিড ও নিউরেট্রোন্সমিটার তৈরির কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করছে। ঐ এমাইনো এসিড ও নিউরেট্রান্সমিটার সিনাপ্স বলিষ্ঠ করে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির বর্তনীকেই আরো সুগঠিত করে। দেখা যাচ্ছে আলজাইমার ও অনুরূপ কিছু অসুখে দিবাস্বপ্নের জন্য দায়ী এই অংশটির কাজ ব্যাহত হয়। এতে মনে হচ্ছে আলজাইমারে স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি দীর্ঘস্থায়ী না হতে পারার কারণের মধ্যে এই ব্যাপারটিও থাকতে পারে।

সর্বাধুনিক গবেষণা এভাবে প্রমাণ করেছে যে আমি যখন জেগে থেকেও কোন মনোযোগী কাজ করছিনা তখন আমার মস্তিস্কের একাংশ গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক কাজ করছে। এভাবে জেগে থাকা অবস্থায় তা দিবাস্বপ্নের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় অবদান রাখছে। আবার ঘুমের সময়ও তা আমার জমানো স্মৃতিগুলোর এবং মস্তিষ্কের অন্যান্য কিছু অংশের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করছে।

কীভাবে শিখি

অভ্যস্ত হয়ে শেখা

যেভাবে অভ্যস্ত হয়ে আমরা নানা বিষয়কে স্মৃতিতে আনি, সেভাবেই আমরা শিখি। এদিক থেকে হেবের তত্ত্বটি খুবই প্রযোজ্য– যেটি আমরা স্মৃতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে দেখেছি। আমাদের অনুভূতি যখন বাইরের কোন উত্তেজনায় সাড়া দেয় প্রথম দিকে সাড়াটি প্রবল থাকে। তারপর বার বার একই উত্তেজনা পেতে থাকলে অনুভূতি ভোতা হয়ে পড়ে, সাড়াটি কমে যায়। যেমন হঠাৎ কোলাহলপূর্ণ জায়গায় এসে পড়লে কোলাহলের সবগুলো আলাদা শব্দের প্রতি আমরা মনোযোগ দিই, হয়তো বিরক্তি বোধ করি। কিন্তু এরকম একটি কোলাহলের মধ্যেই যদি সর্বক্ষণ কাটাতে হয় তা হলে এটি আমাদের কাছে স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। আমরা এর উপস্থিতি আর লক্ষ্যই করিনা, এটি আমাদের জন্য একটি স্বাভাবিক পটভূমিতে পরিণত হয়।

কিন্তু এই পটভূমি কোলাহলের মধ্যেই যদি অদ্ভূত কিছু শব্দ হয় যা ঐ স্বাভাবিকের ব্যতিক্রম তখন সেটি আমাদের মনোযোগে ও অনুভূতিতে তীব্রভাবে আঘাত করে, আমরা এতে আবার বড় আকারে সাড়া দিই। এভাবে সৃষ্ট বড় সাড়া ভবিষ্যতের জন্য আমাদের মস্তিস্কে গ্রথিত হয়ে থাকে। শেখার একটি পদ্ধতি এটিই। খুবই সরল, খুবই মৌলিক ক্ষেত্রে সামুদ্রিক শামুক কী ভাবে মৃদু স্পর্শ বা জোরালো স্পর্শে ফুলকা গুটিয়ে সাড়া দিতে শেখে তা আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি। যেমনটি ঐ পরীক্ষণে দেখা গেছে, অনেকটা সেভাবে আমাদের অনেক জটিলতর ক্ষেত্রেও এই ভাবে শেখার কাজটি হয়ে থাকে। এ জন্য দরকার সাড়া দেবার মত এক একটি বিষয়ে আমাদের অভ্যস্ত হয়ে পড়া, আবার একই সঙ্গে ওর মধ্যে ব্যতিক্রমী নাড়া দিয়ে আমাদের অনুভূতিকে সবল ভাবে ধাক্কা দেয়া। শামুকের ক্ষেত্রে যেমন আমাদের ক্ষেত্রেও তেমনি এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত আছে সিনাপ্‌স বলিষ্ঠকরণের বিষয়টি।

সম্পর্কিত বিষয়ের মাধ্যমে শেখা

শেখার ক্ষেত্রে সব চেয়ে ব্যাপক যে পদ্ধতি বরাবর স্বীকৃত তা হলো একটি বিষয়ের সঙ্গে আর একটি বিষয়কে সম্পর্কিত করে। এর ফলে একটি জানা জিনিসের সঙ্গে অজানা বিষয়টি সম্পর্কিত করে ঐ সম্পর্কের মাধ্যমে নূতনটি শেখা হয়। ঐ সম্পর্ক স্থাপনের প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় 'এ্যাসোসিয়েশন'। যেমন একটি বানর একটি নূতন ফল খেলো। এর ফলে এমন অস্বস্থি বোধ

করলো যে পরে ঐ ফলটির থেকে সব সময় দূরে রইলো। স্পষ্টত বানরটি অস্বস্থি বোধকে ঐ ফল খাওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত করেছে এবং এভাবেই শিখেছে ফলটি সুবিধার নয়। ঐ দুটি জিনিসকে বানর সম্পর্কিত করলো কী প্রক্রিয়ায়? খুব সম্ভব তার স্মৃতির মধ্যে দুটি ঘটনা পরস্পর এমন ভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে অস্বস্থি বোধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফলটি খাওয়ার কথা মনে পড়েছে। এমনিভাবে পরিবেশের দুটি জিনিস যদি অনুভূতিতে এক সঙ্গে আসে তা হলে তা শেখার আওতায় আসে। শিশুকে কোন জিনিসের নাম শেখাবার জন্য আমরা নামটি বলি আর একই সঙ্গে জিনিসটির দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করি। এভাবে শিশুর স্মৃতিতে এই দুটি একত্রে গেঁথে যায়, সে নামটি শেখে। এখানে কৌশলটি হচ্ছে মনোযোগকে অন্য সব কিছু থেকে সরিয়ে শুধু এই দুটি বিষয়ের উপর নিবদ্ধ করানো- নামটি আর বস্তুটি।

সম্পর্কটি যদি একাধিক দিক থেকে আসে তা হলে শেখাটি আরো জোরদার হয়। খয়েরী রঙের দইকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলি মিষ্টি দই এবং তা একটু তুলে খেতেও দিই - তা হলে শুধু দেখানোর চেয়ে দ্বিগুণ সম্পর্কিত হবে ঐ জিনিসটি তার নাম 'মিষ্টি দই'য়ের সঙ্গে। সম্পর্কিত করার কাজ আরো একভাবে হতে পারে। তা হলো নানা ভাবে করে দেখতে দেখতে সঠিক সম্পর্কটি বের করা, ভুল করতে করতে শেখা (ট্রায়াল এ্যাণ্ড এরর)। এ জন্য অবশ্য সঠিক কোনটি তা জানা থাকতে হবে, যখন শেষ পর্যন্ত সেটিই হবে তখন তাকে চিনে নিতে হবে। একটি জিনিস শিখতে অনেক জিনিসের ভেতর দিয়ে যেতে হয় বলে এ পদ্ধতির দক্ষতা কম। দুটি জিনিসকে আরো এক ভাবে সম্পর্কিত করা যায়। একটির অনুকরণে যদি অন্যটি সৃষ্টি করা হয় তা হলেও এ সম্পর্কের মাধ্যমে শেখা যায়। অনুকরণের মাধ্যমে আমরা সব সময় শিখছি। কারো উচ্চারণ শুনে আমরা তা নকল করি। কেউ লিখে দিলে শিশু সেই লেখার ভঙ্গি অনুকরণ করে লেখার চেষ্টা করে। এসব ক্ষেত্রে শেখাটির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে– যেমন ঠিক ঐ লেখাটির মত করেই লেখার লক্ষ্য। কিছু কিছু শেখা অবশ্য আমাদের হয়ে যায় অনেকটা উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে খেলাচ্ছলে অনুকরণ করে। শৈশবে বড়দের মতো অনেক কিছু খেলাচ্ছলে অনুকরণ করতে করতে আমরা শিখি। প্রাণি জগতেও এটি অহরহ ঘটছে। বিড়াল ছানা মাকে ইঁদুর ধরতে দেখে নিজেও ছোট পোকা মাকড়কে নিয়ে শিকার করার মত করে খেলে। বড়দেরকে লড়তে দেখে শিশু পশু– নিজেদের মধ্যে মজা করে লড়াই লড়াই খেলে। এই সব কিছু করার পেছনে কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য না থাকলেও ভবিষ্যতের জন্য শেখার কাজটি কিন্তু ঠিকই ঘটে।

মানবেতর প্রাণির ক্ষেত্রে অনুকরণের কাজটি ঘটে এক রকম স্নায়ুকোষের মাধ্যমে যাকে বলা হয় মিরর নিউরোন অর্থাৎ আয়না-নিউরোন। এর কাজ হলো অন্যের অঙ্গ-ভঙ্গি যা প্রাণিটি দেখে সেই দেখার অনুভূতি থেকে নিজের সঠিক অঙ্গ-প্রতঙ্গ নাড়াচাড়া করে। এভাবে যা দেখছে তা সহজাত ভাবে অনুকরণ করতে পারে। এ যেন দর্শন অনুভূতি মিরর নিউরোনে প্রতিফলিত হয়ে মস্তিষ্কের মোটর অংশে সঠিক সিগন্যাল তৈরি করতে পারে যাতে করে ঐ নড়াচড়া এটি নিজেও করতে পারে। বানর বা শিম্পাঞ্জি যা দেখে তাই করার চেষ্টা করে– এটি সেই মিরর নিউরোনের ফলেই। ১৯৯৬ সালে বানরের কোর্টেক্সের F5 নামক অংশে এই মিরর নিউরোন আবিষ্কৃত হয়েছে । আরো সাম্প্রতিক কালে পি ই টি ইমেজিং এর মাধ্যমে দেখা গেছে মানুষের মস্তিষ্কে F5 এর তুলনীয় হচ্ছে ব্রোকা অঞ্চল- যা কিনা বাচনের জন্য ভাষা অঞ্চল। এই আবিষ্কার থেকে একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অঙ্গ-ভঙ্গির সঙ্গে ভাষার একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। বানরের অঙ্গভঙ্গি মানুষে এসে ভাষায় যেমন বিকশিত হয়েছে, তেমনি মানুষের ক্ষেত্রে শেখার প্রক্রিয়ায় ভাষা একটি বড় স্থান দখল করেছে।

মানুষের মস্তিষ্কে মিরর নিউরোন সদৃশ অংশ এম আর আই স্ক্যানে দেখা গেছে। এতে অন্যের একটি কাজ দেখার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও সেকাজ করলে এই অংশ উদ্দীপ্ত হতে দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে এই মিরর নিউরোন সদৃশ নিউরোনই অন্যের আবেগ বুঝার ও তার প্রতি সহমর্মি হবার ক্ষমতার জন্য দায়ী। অটিজম ও অন্যান্য কিছু মানসিক রোগের কারণে এমন ক্ষমতা যাদের কম থাকে তাদের এই নিউরোনের সক্রিয়তার অভাব দেখা যায়। সহমর্মিতা ছাড়াও শিক্ষণের ক্ষেত্রেও এই মিরর-সদৃশ নিউরোন বড় ভূমিকা পালন করে বলে মনে হচ্ছে।

ভাষার মাধ্যমে দুটি বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন

মানুষ যখন ভাষার অধিকারী হয়েছে তখন শেখার একটি খুবই সম্ভাবনাময় রাস্তা খুলে গিয়েছে– সেটি হলো বর্ণনার মাধ্যমে শেখা। এখানেও মূল পদ্ধতিটি হলো দুটি বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের। ভাষার বর্ণনায় যে মানসিক ছবিগুলো উজ্জীবিত হয় তার একটি যদি ইতোমধ্যেই স্মৃতিতে থাকে তা হলে এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে অন্য একটি মানসিক ছবির মাধ্যমে শেখা চলতে পারে। কাজেই জানা ধারণার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেই অজানা ধারণা শেখা যায়, সেটি ভাষায় বর্ণনার মাধ্যমে হলেও।

যদিও শামুকের উত্তেজনায় সাড়া দিতে শেখা, কি মুরগির নানা জিনিস ঠুকরিয়ে অপ্রিয় স্বাদের বস্তুকে এড়িয়ে যাওয়া থেকে আমাদের শেখাটি মৌলিক ভাবে ভিন্ন কিছু নয়, তবুও বিশেষ করে ভাষার ব্যবহার একে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী রূপ দিয়েছে। একই পরস্পর সম্পর্কের পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা শুধু ঠেকে ঠেকে ভুল করতে করতে নয়, শুধু অনুকরণ করার মাধ্যমেও নয়, নেহাৎ বর্ণনা শুনে বা পড়েই অনেক কিছু শিখতে পারি। সচরাচর আমরা সেভাবে প্রচুর শিখি। একসময় এই বর্ণনা থেকে শেখার জন্য আমরা শুধু শ্রুতির উপর নির্ভর করেছি। পরে লিপি উদ্ভাবন করে লিপিবদ্ধ বর্ণনা থেকেও শিখেছি। এভাবে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আগের জ্ঞান ভান্ডারের সঙ্গে ভাষার মাধ্যমে ক্রমাগত আরো নূতন জ্ঞান যোগের সুযোগে আমাদের শেখার শক্তি ক্রমাগত বেড়ে গেছে।

যদিও বিষয় অনুধাবনের মাধ্যমে জানা বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনটিই হলো সত্যিকারের শেখার উপায়, কিন্তু তার মধ্যে আমরা একটি শর্টকাটের অবতারণা করেছি- তা হলো কৃত্রিমভাবে মুখস্থ করা। কোন কিছুর ভাল স্মৃতি সৃষ্টি হতে হলে সেটি অনুধাবনের অর্থাৎ তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটিকেই স্নায়ুতে ধারণ করাটাই হলো সর্বোত্তম প্রক্রিয়া। সেটি সম্ভব না হলে বা না করতে চাইলে আমরা কৃত্রিমভাবে মুখস্থ করি। ক্ষেত্র বিশেষে কাজে আসলেও সেটি একটি অদক্ষ প্রক্রিয়া।

শেখার অভ্যাস মস্তিষ্ককে আরো শেখার উপযুক্ত করে

মস্তিষ্কের নমনীয়তা অর্থাৎ এর স্নায়ু তারকে বার বার নূতন করে বাঁধার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাটিই একে শেখার অনুকূল করে তুলেছে। যতই এটি করা হবে, ততই তার শেখার ক্ষমতাটি বাড়বে। শেখার প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্ক বাইরে থেকে স্নায়ু-সিগন্যাল পায়। একটি স্নায়ুকোষ যখন অন্যটিকে এ সিগন্যাল দেয় তখন দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে তার একটি ফিরতি সিগন্যাল ফীডব্যাক হিসাবে ফেরৎ দেয়, যা মূল সিগন্যালকে হয় উচ্চকিত করে নয়তো অবদমিত করে। এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে স্নায়ু সংযোগগুলো বিশেষ করে সিনাপসগুলো বলিষ্ঠ হয়– যার ফলে ভবিষ্যতে একই ধরনের সিগন্যালে সাড়া দেয়া তার জন্য সহজতর হয়। এটি আমরা স্মৃতির আলোচনায় দেখেছি। যা স্নায়ু সিগন্যালকে একবার উচ্চকিত করেছে ভবিষ্যতে সেটি তাকে আরো উচ্চকিত করবে। যেটি অবদমিত করেছে, সেটি আরো অবদমিত করবে।

মস্তিষ্কের এই নমনীয়তাই প্রাণির শেখাকে কম্পিউটার বা অনুরূপ যন্ত্রের শেখা থেকে ভিন্ন করে তুলেছে। শিশুদের মস্তিষ্ক বয়স্কদের চেয়ে অনেক বেশি নমনীয় তাই তাদের শেখার গতিও দ্রুততর। নমনীয়তার ফলে পারিবেশিক বাধা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি শেখার ক্ষেত্রে নেতিবাচক পরিস্থিতি সৃষ্টি করলে মস্তিষ্ক তা অতিক্রম করতে পারে। গুরুতর স্ট্রোকের রোগীর ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে কিছু সময় রক্ত সঞ্চালনে বিঘ্নের ফলে এর কোন কোন অংশের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা, অনুভূতি, বাচন, চিন্তা, চেতনা অনেক কিছুই ব্যাহত এমনকি সম্পূর্ণ বিকল হয়ে যেতে পারে। কিন্তু দেখা যায় যে ব্যায়ামের মাধ্যমে চর্চার ফলে মস্তিষ্কে ক্ষতিগ্রস্থ স্নায়ুর আশে-পাশের ভাল স্নায়ুগুলো ঐ দায়িত্বগুলো গ্রহণের জন্য পরিবর্তিত হতে পারে।

বুদ্ধিমত্তা কী

চালাকের মত কাজ মাত্রই বুদ্ধি নয়

বাইরে থেকে দেখে বুদ্ধি প্রয়োগ মনে হলেও- চালাকির সব কাজ কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে হয় না। অনেক কিছুই ঘটে যাকে আমরা সহজাত প্রবৃত্তি বলতে পারি– বুদ্ধি নয়। প্রাণি জগতে এমনটি প্রায়শ দেখা যায়– যেখানে অল্প কয়েকটি সুনির্দিষ্ট চালাকির কাজ তার জেনেটিক বার্তায় লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে, জন্মসূত্রে পাওয়া। বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় টিকে থাকার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক বলেই জেনেটিক বার্তায় এমন বার্তা স্থায়ী হয়েছে। একে বুদ্ধি বলা চলেনা। একটু বাজিয়ে দেখলেই সেটি বুঝা যায়। এক ধরনের সাপ রয়েছে যারা আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকলে উল্টে গিয়ে মরার মত পড়ে থাকে। একে তাদের আত্মরক্ষার একটি বুদ্ধি মনে করা হতো। কিন্তু পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেছে যে ডিম থেকে সদ্য বের হওয়া ঐ সাপের নবজাতকও আক্রমণকারী কাউকে দেখলে এরকম উল্টে মরার মত পড়ে থাকে। এভাবে সুস্পষ্ট বুঝা গেছে এটি সাপের সহজাত প্রবৃত্তি, এর সঙ্গে অভিজ্ঞতার কোন সম্পর্ক নাই। অভিজ্ঞতা ছাড়া বুদ্ধি হয়না। প্রাণির ক্ষেত্রে টিকে থাকার জন্য সুবিধাজনক এরকম সহজাত প্রবৃত্তির উদাহরণ অনেক দেখা যায়। ক্ষেত্র বিশেষে সেগুলো বেশ খানিকটা জটিল প্রকৃতিরও হতে পারে। যেমন পাখির বাচ্চা সাধারণ অন্য পাখির উড়াতে বিচলিত হয়না, আকাশ মেঘে ঢেকে গেলেও বিচলিত হয়না, কিন্তু চিল বা বাজ পাখির আকাশে চক্কর দেয়ার ছায়া অনুভব করা মাত্রই লুটিয়ে মাটিতে চেপ্টা হয়ে লুকিয়ে যাবার চেষ্টা করে। তার জেনেটিক বার্তায় এই সব আচরণের নির্দেশ রয়েছে বলেই এটি সম্ভব হয়।

অবশ্য এসবের মানে এই নয় যে বুদ্ধির প্রয়োগ শুধু আমরা মানুষের মধ্যে রয়েছে, অন্য প্রাণির নাই। প্রাণিদের মধ্যে কারো কারো বুদ্ধির ভাল পরিচয় রয়েছে। অতি সাধারণ একটি প্রাণি দাঁড় কাক। তবুও বুদ্ধির জন্য তার খ্যাতি রয়েছে। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কিছু পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে কাক ঝিনুকের খোলার মধ্যে আবদ্ধ তার নরম অংশগুলো খাওয়ার জন্য বার বার এটি ভাঙ্গার চেষ্টা করে। ক্রমাগত আরো উপরে উড়ে গিয়ে সেখান থেকে ঝিনুকটি শক্ত ভূমিতে ফেলে কাক এই চেষ্টা করে। এটি চলতেই থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত ঝিনুকটি না ভাঙ্গে। একে বুদ্ধির বদলে সহজাত প্রবৃত্তি বলা কঠিন। তা যদি বলিও আরো সাম্প্রতিক কালে যা দেখা গেছে তাকে সহজাত প্রবৃত্তি বলে

উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। ব্যস্ত নগরীর মাঝে ট্রাফিক লাইটের কাছে দাঁড় কাককে দেখা গেছে ভাঙ্গার জন্য শক্ত খোলসের বাদাম রাস্তায় রেখে যেতে। লাল বাতিতে যে সব গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে সেগুলোর সামনেই বাদাম রেখে যায় এটি। পরে গাড়ি এর উপর চলে গিয়ে শাঁস বের করে দিলে কাক এসে তা খাওয়ার জন্য নিয়ে যায়। একে সহজাত প্রবৃত্তি বলা যাবেনা কারণ সুদূর অতীতে যখন বিবর্তনের মাধ্যমে এই অভ্যাস কাকের ডিএনএতে যেতে পারতো তখন নগরী, গাড়ি, ট্রাফিক লাইট কিছুই ছিল না। কাককে বর্তমান অভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে বুদ্ধি খাটিয়েই এটি করতে হয়েছে।

এক্ষেত্রে সহজাত প্রবৃত্তি থেকে বুদ্ধিকে আলাদা করার উপায় হলো নূতন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে নূতন ধরনের উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে কিনা তা দেখা। এই উদ্ভাবনশীলতা, এই নমনীয়তাটাই হলো বুদ্ধির একটি বড় পরিচয়। সহজাত প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে এগুলো অনুপস্থিত। প্রবৃত্তি কাজ করে শুধু সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সাড়ার মাধ্যমে– নূতন পরিস্থিতি দেখা দিলে এটি নাচার। মানুষের মস্তিষ্ক যে খুবই উচ্চতর বুদ্ধির উপযুক্ত তার কারণ এটি পরিস্থিতির পরিবর্তনে তার বুদ্ধি-পরিকল্পনায় যথেষ্ট পরিবর্তন আনতে পারে। তাছাড়া এই পরিকল্পনার ধাপগুলোর জটিলতাই মানুষের উচ্চতর বুদ্ধিকে অন্য প্রাণির সরলতর বুদ্ধির থেকে আলাদা করে। মস্তিষ্কে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার যোগান মানুষের ক্ষেত্রে এর সুযোগ করে দেয়।

সরল অনুসরণও বুদ্ধি নয়

অন্যকে চালাকির একটি কাজ করতে দেখে হুবহু তা অনুকরণ করাটি বুদ্ধির পরিচয় নয়, যদি না তা করার ক্ষেত্রে নিজস্ব বিবেচনা কাজ করে। প্রাণিদের কেউ কেউ অনেকটা সহজাত ভাবে অনুকরণ করতে পারে। যেমন বানরের মস্তিষ্কে মিরর নিউরোনের কথা ইতোমধ্যে বলছি যার মাধ্যমে সে চোখে অন্য কাউকে যেভাবে হাত পা নাড়াতে বা মুখভঙ্গি করতে দেখে তার নিজের পেশিগুলোকেও ওভাবে চালনা করতে পারে। ময়না পাখি মানুষের গলার স্বর শুনে তা নকল করতে পারে। একটু পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে এ ধরনের কাজের মধ্যে বিবেচনা বা বুদ্ধির পরিচয় নাই- এটি নেহাতই অনুকরণের।

তবে অনুকরণ মাত্রই বুদ্ধির ক্ষেত্রে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অনুকরণ বুদ্ধির প্রাথমিক প্রস্তুতি হতে পারে পরে। তা আত্মীকৃত করে নিজের বিবেচনায় বুদ্ধির দিকে খানিকটা এগিয়ে যাওয়া যায়। মজার ব্যাপার

হলো খুব স্পষ্টভাবে দেয়া একটি নির্দেশিকা অনুসরণ করাটিও বুদ্ধি পরিচয় নয়। এটি আমরা মাথা না খাটিয়েও যান্ত্রিকভাবে করে যেতে পারি। যেমন কম্পিউটারে কোন সফ্‌টওয়্যার ইনষ্টল করতে চাচ্ছি বা একটি যন্ত্রকে চালু করতে চাচ্ছি– নির্দেশিকায় একেবারে ধাপে ধাপে এটি টেপ, ওটি টেপ, এটি ঘুরাও ইত্যাদি নির্দেশ দেয়া রয়েছে। স্পষ্টত এটি করতে তেমন কোন বুদ্ধির প্রয়োজন হবে না। বুদ্ধির প্রয়োজন হবে নির্দেশগুলো যখন অস্পষ্ট হবে, অথবা দ্ব্যর্থক হবে, অথবা কোন কোন ধাপ দেয়াই থাকবেনা– সেরকম ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে আমরা কী করবো? খুব সম্ভব আন্দাজ করে নিয়ে কাজটি করবো। এই আন্দাজ করাটাই বুদ্ধি। কারণ আন্দাজ শুধু করলেই হবেনা, তা যথাসাধ্য সফল হবার মত করতে হবে। ভাল আন্দাজ করাটাই যে বুদ্ধি, সেটি আমরা এখন দেখবো।

সঠিক আন্দাজ করা

ধরা যাক আমি দূর থেকে একজন ভদ্রলোককে দেখছি তিনি একটি বড় কাগজ হাতে রাস্তার দিকে এবং একটি বাড়ির দিকে তাকাচ্ছেন, আবার কাগজটির দিকেও তাকাচ্ছেন। দূর থেকে এর বেশি তথ্য আমি পাচ্ছিনা। কিন্তু তাতে আমার আন্দাজ থেমে থাকছেনা। কাগজটি ভাল ভাবে দেখা না গেলেও এর আকার, ভাঁজ ও ব্যবহার থেকে আন্দাজ করছি এটি একটি ম্যাপ হবে, আর ভদ্রলোক ম্যাপের সাহায্যে রাস্তাটিতে কোন একটি বাড়ি খুঁজে নেবার চেষ্টা করছেন। এও আমি আন্দাজ করতে পারছি যে তিনি এই এলাকার মানুষ নন। বরং তাঁর ম্যাপ ব্যবহার দেখে মনে করতে পারি তিনি বিদেশে থাকেন। অথচ চেহারায় বাংলাদেশি। কাজেই এমন প্রবাসী বাংলাদেশি হতে পারেন যিনি বহুদিন ধরে উন্নত কোন বিদেশে থাকেন যেখানে শহরের ম্যাপ দেখে রাস্তাঘাট চেনার রীতি রয়েছে। এই আন্দাজগুলোর সব হুবহু ঠিক নাও হতে পারে। কিন্তু তা হলেও আমি এখানে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিচ্ছি।

এই আন্দাজগুলোই যে আসলে বুদ্ধি তার কারণ এতে কতগুলো জিনিসের প্রয়োজন একসঙ্গে হয়েছে। প্রথমত যেটুকু তথ্য পেয়েছি তার ভাল অনুধাবনের প্রয়োজন হয়েছে– যেমন এক্ষেত্রে কাগজটির চেহারার, তাকাবার ভঙ্গির ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত এর জন্য দরকার হয়েছে অভিজ্ঞতার, এবং পূর্ব-ধারণার কিছু তথ্য ভান্ডারের। উন্নত দেশে একাজে ম্যাপ ব্যবহারের অভিজ্ঞতা, ভাঁজ করা শহরের বড় ম্যাপ সম্পর্কে ধারণা ইত্যাদি এর মধ্যে পড়ে। তৃতীয়ত ব্যাপারটির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমৃদ্ধ পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন এর জন্য

আমাকে করতে হয়েছে– যেমন কাগজটির সঙ্গে ম্যাপের, ম্যাপের সঙ্গে রাস্তার ও বাড়ির, এসবের সঙ্গে মানুষটির, তাঁর চেহারার (বাংলাদেশি) সঙ্গে আচরণের (বিদেশির মত), ইত্যাদি। চতুর্থত এর জন্য আমার স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি– অর্থাৎ তাৎক্ষণিক কর্মরত স্মৃতিকে (ওয়ার্কিং মেমোরি) বেশ দক্ষ হতে হয়েছে। এই কর্মরত স্মৃতির সাহায্যে একের সঙ্গে আরেক মিলিয়ে সেই ফলাফলকে আমি অল্পক্ষণ ধরে রাখতে পেরেছি পরের ধাপে আর একটি কিছুর সঙ্গে মেলাবার জন্য। যেমন করে বড় যোগ অংক করার সময় আমরা হাতে রাখা ফলকে কিছুক্ষণ ধরে রাখি পরের লাইনের সঙ্গে যোগ না করা পর্যন্ত। একই সঙ্গে এরকম বেশ কিছু মধ্যবর্তী ফলাফল এভাবে কর্মরত স্মৃতি দিয়ে আমাকে প্রসেস করতে হয়েছে। এই চারটি জিনিস মিলিয়েই বুদ্ধির পরিচয় দেয়া অর্থাৎ ভাল আন্দাজ করা সম্ভব হয়েছে।

এসব থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে এই সোজা ব্যাপারটির সঠিক আন্দাজের কাজটি খুব সহজ সরলভাবে হয়নি, মস্তিষ্কের অনেকখানি সক্ষমতা এখানে কাজে লেগেছে। আর একটি উদাহরণ নেয়া যাক, এবার অন্য প্রাণির বুদ্ধি নিয়ে। একটি কুকুর সামনের ঘরে বসে ঝিমুচ্ছে। দরজার সামনে অপরিচিত পায়ের একটু শব্দ হলো। অমনি ঐ ঝিমানো কুকুর লাফ দিয়ে দরজার কাছে এসে চিৎকার করে বাড়ি মাৎ করছে। কাজটি তার জন্য সহজ হয়নি। অতি সামান্য তথ্য সে পেয়েছে পায়ের শব্দের আকারে। ঐটুকু থেকে অনেক কিছু তাকে সঠিক আন্দাজ করতে হয়েছে। ঐ শব্দের অনুধাবনটি ছিল যথেষ্ট কঠিন একটি কাজ। রাস্তার গাড়ীর শব্দ, কোলাহল, বাড়ির ভেতরে অন্যান্য শব্দ ইত্যাদি বহু রকম বহু শব্দের মধ্যে পায়ের শব্দ, বিশেষ করে অপরিচিতের পায়ের শব্দ হিসেবে এটি তাকে আলাদা করে নিতে হয়েছে। এই শব্দটিও সুনির্দিষ্ট একই রকম নয়–বরং এক এক জনের পায়ের, জুতার, হাঁটার কারণে শব্দটি বিভিন্ন। তার মধ্যেই চলেছে অনুধাবনের কাজটি। যদি শব্দের সেন্সর সহ একটি কম্পিউটারকে এই কাজ করতে হতো তাহলে ঐ কম্পিউটারে সম্ভাব্য সব রকম শব্দের ও তার মধ্যে সম্ভাব্য সব রকম নয়েজ থেকে তাকে আলাদা করার সকল তথ্য দিয়ে এটিকে প্রোগ্রাম করতে হতো– যার ফলে প্রোগ্রামটি হতো অসম্ভব রকমের দীর্ঘ ও জটিল। কিন্তু কুকুরের মস্তিষ্ক এসব কাজ শর্টকাটে করেছে মস্তিষ্কের বিশেষ গুণের কারণে। শুধু তাই নয়, অপরিচিতের বাড়িতে আসা, এবং তা অন্যদের পছন্দ না হবার অনেক পূর্ব অভিজ্ঞতা কুকুরটির থাকতে হয়েছে। তাছাড়া পায়ের শব্দের সঙ্গে অপরিচিত মানুষের, তার আগমণের সঙ্গে কোন আশংকার ইত্যাদি পারস্পরিক সম্পর্ক তাকে স্থাপন

করতে হয়েছে, স্বল্পস্থায়ী কর্মরত স্মৃতিকেও কাজে লাগাতে হয়েছে। তাই ব্যাপারটিতে সঠিক আন্দাজের অর্থাৎ বুদ্ধির সব উপাদানগুলো রয়েছে– হোকনা সে এমন একটি প্রাণি, যার বুদ্ধির ক্ষমতা মানুষের চেয়ে অনেক সীমিত প্রকৃতির। কুকুর একাজে কম্পিউটারের পথে যায়নি– কারণ মস্তিষ্ক ভিন্নভাবে কাজ করে। মস্তিষ্ক সরাসরি আওয়াজটির প্রকৃতি আন্দাজ করে নিয়েছে। এর সঙ্গে সঠিক সম্পর্কগুলো স্থাপন করেছে। মস্তিষ্কের পূর্বজ্ঞানের স্মৃতি তাকে সরাসরি ঐ পথে নিয়ে গিয়েছে– তাকে অসংখ্য তথ্য ঘাঁটতে, তুলনা করতে ও বাতিল করতে হয়নি কম্পিউটারের মত। এখানে মস্তিষ্কের একটি সুবিধা হলো তার কাছে আসা সিগন্যাল জটিল প্রকৃতির, তাতে অনেক বার্তা মেশানো থাকে– কম্পিউটারের মত সোজা সাপটা এক সিগন্যালে এক বার্তা নয়। এভাবে মস্তিষ্কে আসা সিগন্যালে প্রয়োজনের অধিক অতিরিক্ত তথ্য থাকে। এসব একাধিক তথ্যের সাক্ষ্য থেকে মস্তিষ্ক সরাসরি আন্দাজে যেতে পারে। সেই আন্দাজকে যথেষ্ট নিশ্চয়তাও দিতে পারে।

অন্য প্রাণির তুলনায় মানুষের মস্তিষ্কের এই ক্ষমতাগুলো অনেক গুণে বেশি। তার অনুধাবনের ও পূর্বাভিজ্ঞতার জগতটি অনেক বেশি বড়। তার কাছে আসা সিগন্যালে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিকল্প তথ্যের সাক্ষ্যও অনেক বেশি। কাজেই তার আন্দাজগুলো আরো বিচিত্র ক্ষেত্রে আসে, আরো অধিক নিশ্চয়তার সঙ্গে আসে। আবার এক এক মানুষ ক্ষেত্র বিশেষে এতে পারদর্শিতা দেখায় অন্যদের চেয়ে বেশি– তখন আমরা বলি তার বুদ্ধি বেশি।

আন্দাজ করার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কাজগুলো

আমরা আগেই দেখেছি সঠিক আন্দাজ করার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো একটি বিষয়ের সঙ্গে অন্য একটি বিষয়ের নূতন কোন পারস্পরিক সম্পর্ককে (এ্যাসোসিয়েশন) চিহ্নিত করা। এই সম্পর্কটি যৌক্তিক হতে হবে, নেহাৎ কাকতালীয় হলে চলবে না। সঠিক আন্দাজ করার কাজটি নানাভাবে এই সম্পর্ক চিহ্নিত করার সঙ্গে জড়িত। তাই উচ্চতর বুদ্ধির জন্য অর্থাৎ খুব ভাল আন্দাজ করার ক্ষেত্রে কয়েকটি কাজের পারদর্শিতার প্রয়োজন যেগুলো শুধু মানুষের মধ্যে রয়েছে বলে জানি। এর একটি হলো কল্পনা শক্তি। এর অভাবে এই স্তরের পারস্পরিক সম্পর্কগুলোকে খুঁজে পাওয়া যাবেনা, প্রত্যেকটি নূতন পরিস্থিতিকে একেবারে আলাদা ও অজানা মনে হবে। আর কল্পনা শক্তি থাকলে সঠিক সম্পর্কগুলো খুঁজে পাওয়া যায়। তখন সে যেনতেন সব রকমের

সম্পর্ককে পাইকারি ভাবে যেমন গ্রহণ করবেনা তেমনি এমনো হবেনা যে কোন সম্পর্কই দেখতে পাচ্ছে না।

কল্পনার সঙ্গে সেজন্য চাই বিচার বুদ্ধি। এক দিক থেকে বিচার বুদ্ধি হলো সঠিক সম্পর্কগুলো খুঁজে পেতে তথ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে পারা। যখন প্রাপ্ত তথ্যের ১০০% এ কাজে ভালভাবে ব্যবহৃত হতে পারে ওটিই সবচেয়ে ভাল বিচার বুদ্ধি। আর ০% ব্যবহৃত হলে বিচার বুদ্ধির পরিচয় শূণ্য, কারণ সম্পর্ক খুঁজে পেতে প্রাপ্ত তথ্যের কোনটিকেই ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি এতে। বুদ্ধিমত্তাও সেখানে তাই অনুপস্থিত। আগের একটি উদাহরণে বাড়ি খোঁজা মানুষটির হাতের কাগজের যেটুকু দেখেছি, তার আচরণের যেটুকু দেখেছি তার চেহারার যেটুকু দেখিছি সব তথ্যকে যদি আমি সম্পর্ক স্থাপনের কাজে লাগাতে পারি তা হলে বুদ্ধির পরিচয় ভালই দিয়েছি বলতে হবে। কতগুলো পারস্পরিক সম্পর্ক আসলে স্বাধীন কোন নূতন সম্পর্ক নয়, অন্য সম্পর্ক থেকে লজিক বা যুক্তিধারা অনুযায়ী তাকে পাওয়া যায়। অন্য সম্পর্ক থেকে যৌক্তিক ভাবে বের না করে এর জন্য নূতন সম্পর্ক খোঁজা বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। যেমন বাজারে সংঘটিত একটি দুর্ঘটনার সঙ্গে একজন বিশেষ ব্যক্তি যে জড়িত ছিল না সেটি আমি বুঝতে পারছি কারণ সেই সময় সেই ব্যক্তিকে বাড়িতে দেখেছি। বাজারের দুর্ঘটনায় তার থাকা না থাকা নিয়ে আমার কোন ইন্দ্রিয় অনুধাবন নাই, কোন তথ্যও নাই। এই ব্যক্তিকে নিয়ে সেখানকার কোন পারস্পরিক সম্পর্ক আমি আলাদা করে চিহ্নিত করিনি। কিন্তু ঐ সময় বাড়িতে তাকে দেখার অনুধাবন থেকেই লজিক ব্যবহার করে আমি ঐ সম্পর্কটা যৌক্তিকভাবে নির্ণয় করেছি। এক্ষেত্রে যুক্তিটি হলো কোন বস্তু বা ব্যক্তি একই সঙ্গে দুই পৃথক জায়গায় থাকতে পারে না। ভাল আন্দাজ করার জন্য যৌক্তিক নির্ণয়েরও প্রয়োজন। কল্পনা শক্তি, বিচার বুদ্ধি, যৌক্তিক নির্ণয় এই সবগুলোর প্রয়োজন হয় ভাল আন্দাজ করতে। আর এর সবগুলো মানুষের মধ্যেই সত্যিকার বিকশিত হয়েছে। অন্য প্রাণির বুদ্ধির সীমাবদ্ধতাগুলোও এখানেই। ঐ যুক্তিটিও মানুষেই উদ্ভাবন করেছে তার অভিজ্ঞতা থেকে।

এসবের একটি বাড়তি ফলাফল হলো শিক্ষণ লাভে সামর্থ আর বুদ্ধিমত্তার সামর্থ এই দুইয়ের মধ্যে কিছুটা ব্যবধান রচিত হওয়া। উপরে কল্পনা, বিচার বুদ্ধি, যৌক্তিক নির্ণয় ইত্যাদি যে সব কাজের কথা বলা হলো সেগুলোর সঙ্গে শেখার যত না সম্পর্ক তার চেয়ে অনেক বেশি সম্পর্ক রয়েছে সরাসরি অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে, ইন্দ্রিয় অনুধাবনে প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে বহুতরো অর্থ আরোপ করে সেগুলোকে বেশি কাজে লাগানোর সঙ্গে। সাম্প্রতিক কিছু

গবেষণায় নানা প্রাণির প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষমতার সঙ্গে তাদের বুদ্ধিমত্তার তুলনা করে এই দুয়ের মধ্যে তেমন কোন সরল সম্পর্ক পাওয়া যায়নি। শেখার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা যা জানি তাতে পূর্বজ্ঞান সব সময় অপরিহার্য নয়। কিন্তু বুদ্ধিমত্তা হলো পূর্ব জ্ঞানকে কীভাবে ভাল আন্দাজ করতে ব্যবহার করা যায় তারই চ্যালেঞ্জ।

বুদ্ধি চর্চায় মস্তিষ্কে কী ঘটে

এ পর্যন্ত বুদ্ধিমত্তার স্বরূপ নিয়ে যা বলা হলো সেগুলো মস্তিষ্ক কী ভাবে বাস্তবায়িত করে সেটিই বড় প্রশ্ন। প্রশ্নটি কঠিন, একাধিক তত্ত্বে এর উত্তর দেবার চেষ্টা হয়েছে। তার মধ্যে এগিয়ে থাকা একটি তত্ত্ব আমরা কিছুটা দেখতে পারি। একে বলা যায় মস্তিষ্কে কোডিং প্রতিযোগিতার তত্ত্ব।

ইন্দ্রিয় অনুধাবনের ফলে বাইরের ঘটনার কোডিং করে অর্থাৎ তাদের প্রতিনিধিত্ব করে মস্তিষ্কে নিউরোন সিগন্যাল তৈরি হয়। একটির থেকে অন্যটি সামান্য পরিবর্তিত রূপে একই ঘটনার একাধিক কোডিং এভাবে তৈরি হয়। সেগুলোর মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে সমলয়ে আসার (সিনক্রোনাইজেশন) একটি প্রবণতা থাকে। এটি অনেকটা কোরাসে গান গাওয়ার মত– সবাই পরস্পরের সঙ্গে লয় মিলিয়ে নেয় ভাল ঐকতান সৃষ্টির জন্য। একই অনুধাবনের একাধিক কোডিং হতে গিয়ে- মস্তিষ্কে সিগন্যালের ছোট ছোট প্যাটার্নগুলো একটু দূরে দূরে নিজের মত করে আরো কিছু প্যাটার্ন সৃষ্টি করে। এদের বলা যায় মূল প্যাটার্নের ক্লোন বা প্রতিলিপি। তবে ক্লোন হবার সময় হুবহু মূলটির মতো হয়না, কিছুটা বদলে যায়।

এসব ক্লোনগুলোর মধ্যে প্রাধান্য লাভের একটি প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। যেমন 'কোরাসে' সবার গুরুত্ব সমান হলেও কার সঙ্গে লয় ঠিক করে অন্যরা গলা মেলাবে সেটি ঠিক করার প্রতিযোগিতা থাকে। প্রথমে নানা জনের গলার সুরের লয়ে সামান্য তফাৎ থাকলেও শেষ পর্যন্ত ওর সঙ্গেই সবাই গলা মিলায়। এখন মস্তিষ্কে কোডিং প্যাটার্নের ক্লোনগুলোর মধ্যে কোনটি এভাবে প্রাধান্য পাবে তা নির্ভর করে কোনটি মস্তিষ্কে স্মৃতিতে ইতোমধ্যে থাকা অনুরূপ অন্য প্যাটার্নগুলোর সঙ্গে ভাল অনুরণিত (রিজোন্যান্স) হতে পারবে তার উপর। এখানেই স্মৃতিতে সংরক্ষিত পূর্বজ্ঞানের ভূমিকাটি এসে পড়ে। এভাবে যেটি ভাল অনুরণিত হতে পারবে সেটিই পারবে বৃহত্তম 'কোরাসের' আয়োজন করতে। যেই ক্লোনটি এভাবে প্রাধান্য পেল সেটি থেকেই এবার সৃষ্টি হতে

থাকবে নূতন প্রজন্মের আরো ক্লোন, এবার অনেকটা তারই আদলে। ফলে মস্তিষ্কজাত আন্দাজটিও তখন তারই অনুকূলে যেতে থাকবে।

একটি উদাহরণ নিলে ব্যাপারটি ভাল বুঝা যাবে। দোতলায় আমার ঘরের জানালার কাঁচে হঠাৎ একটি শব্দ হলো তাকাতেই দেখলাম গোলমত ছাইরঙের ছোট একটা কিছু কাঁচে সামান্য আঘাত করে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাৎক্ষণিক ভাবে আমার মস্তিষ্কে স্নায়ু সিগন্যাল রূপে এর শব্দ, রং, আকৃতি, আকার, গতি সম্পর্কে কিছু কোড জন্ম নিলো– প্রত্যেকটি গুণের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে। এরপর এদের প্রত্যেকটি কোড মস্তিষ্কে তার কাছাকাছি জায়গায় নিজের ঈষৎ পরিবর্তিত কিছু প্রতিলিপি (ক্লোন) তৈরি করে নিচ্ছে। মনে করি আপাত কোডগুলো ছিল রাবারের আঘাতের মত আওয়াজ, ছাই রং, গোল আকৃতি, কিছুটা নরম কিন্তু দৃঢ়, নিচ থেকে উপরে ছুটে এসেছে এমনি। এদের সম্মিলিত অনুধাবনে আন্দাজটি হতে পারে এটি একটি খেলনা রাবার বল নিচ থেকে কোন বাচ্চা ছুঁড়ে দিয়েছে। কিন্তু এর প্রত্যেক কোডের ক্লোনগুলোর মধ্যে নানা বৈচিত্রও সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ শুধু রঙের কথাই বলি। রঙের কোডের ক্লোনগুলোতে যে সব বৈচিত্র দেখা দেবে তাতে তাদের ক্ষেত্রে মূল ছাই রঙের বদলে ছাই-১, ছাই-২, ছাই-৩ ইত্যাদি পরস্পর কিছুটা ভিন্ন নানা ছাই রঙের কোড সৃষ্টি হবে। তাদের মধ্যে কোডিং প্রতিযোগিতায় কোনটি প্রাধান্য পাবে তাই বিবেচ্য। এই প্রাধান্য নির্ভর করবে মস্তিষ্কের স্মৃতিতে এ রকম পরিস্থিতিতে অনুরণনের জন্য কোন রঙের প্রাধান্য রয়েছে তার উপর। উদাহরণ স্বরূপ এমন হতে পারে যে ঐ নানা ছাই রঙের শেইডের মধ্যে যেটি খয়েরির সঙ্গে মিলে সেটিই প্রাধান্য পাচ্ছে– কারণ স্মৃতিতে থাকা খয়েরি রঙের কোন কিছুর সঙ্গেই অনুরণন ঘটছে বেশি। তখন রঙের কোডিং এর ক্ষেত্রে খয়েরির দিকের কোরাসটিই জোরালো হয়ে উঠবে বিশুদ্ধ ছাই রঙেরগুলোর চেয়ে। জিনিসটি সম্পর্কে আন্দাজটিও পরিবর্তিত হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। যদি দেখা যায় যে এভাবে অন্যান্য গুণের কোরাসগুলোও হচ্ছে রাবারের মত শব্দের বদলে পালকের মত শব্দ, দৃঢ়তার বদলে তুলতুলে ভাব, একেবার গোল আকৃতির বদলে ততটা গোল নয় এমন আকৃতি– তা হলে আন্দাজটি চলে যাবে রাবারের বল নয় বরং খয়েরি রঙের ময়না জাতীয় পাখির জানালায় এসে আঘাত করার দিকে। হয়তো বা অতীতে কাছাকাছি সময়ে এরকম পাখির আঘাত জানালায় ঘটার স্মৃতি রয়েছে বলেই ক্লোন সমূহের কোরাস তার সঙ্গে অনুরণন করেছে এবং আন্দাজটি পাখির দিকে গেছে। এর মধ্যে কোন একটি গুণের কোরাস অত স্পষ্টভাবে পাখির স্বপক্ষে না গেলেও অন্যগুলোর প্রাধান্যের

কারণে পাখির আন্দাজটিই বহাল থাকতে পারে। সব মিলিয়ে কোডিং প্রতিযোগিতায় পাখির সম্ভাবনাই রাবার বল সহ অন্য সব সম্ভাবনার ক্লোনগুলোকে পরাজিত করেছে বলে ধরে নেয়া যায়। এটি যে রকম স্নায়ু প্যাটার্নের ঐকতানগুলো সৃষ্টি করতে পেরেছে অন্য আন্দাজ তেমন পারেনি। এখানেও সঠিক আন্দাজটি করতে পারাটিকে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বলে ধরে নিতে পারি। এর মধ্যে আগে আলোচিত বুদ্ধির সব উপাদান রয়েছে কিনা তা আমরা দেখে নিতে পারি– ভাল অনুধাবন, পূর্ব স্মৃতির ভান্ডার, ঘটনাটির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমৃদ্ধ পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন এবং কর্মরত স্মৃতির অর্থাৎ স্বল্পস্থায়ী স্মৃতির ভাল ব্যবহার। তেমনি এর সহায়ক ক্ষমতাগুলো এতে কতখানি কাজে লেগেছে তাও দেখতে পারি– কল্পনা শক্তি, বিচার বুদ্ধি এবং যৌক্তিক নির্ণয়ন। এই উপাদান আর ক্ষমতাগুলোর জন্যও মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে পৃথক কিছু প্রক্রিয়া ঘটে। সেগুলোর সঙ্গে ঐ কোডিং প্রতিযোগিতার সম্পর্ক এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতেই বুদ্ধির পুরো প্রকাশ। এভাবে বুদ্ধির ক্ষেত্রটি জানালায় পাখির আঘাতের মত ঘটনার মত সরল না হয়ে খুব জটিল হতে পারে– কিন্তু মূল প্রক্রিয়াগুলো সব ক্ষেত্রে একই। তবে মনে রাখতে হবে কোডিং প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বুদ্ধির ব্যাখাটি এখনো একটি ভাল তত্ত্ব মাত্র। এ সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য আরো পরীক্ষণ প্রয়োজন।

বুদ্ধির পরিমাপ

বুদ্ধির পরিমাপের তেমন কোন ভাল ব্যবস্থা আমাদের নাই। তবে আই কিউ– (ইন্টেলিজেন্স কোয়েশন্ট) নামে যে পদ্ধতি চালু রয়েছে তা দিয়ে আপাতত এক রকম কাজ চালিয়ে নেয়া হচ্ছে– যা মোটেও সন্তোষজনক নয়। মূলত আই কিউ হচ্ছে একটি আপেক্ষিক পরিমাপ যার সাহায্যে আমরা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধি সংক্রান্ত কিছু ক্ষমতার তুলনা করতে পারি মাত্র। এটি কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা নয়। যদি সে রকম স্বয়ংসম্পূর্ণ পরম (এবসল্যুট) কোন ব্যবস্থা নীতিগতভাবেও ধরে নিতে হয় তা হলে ইতোপূর্বে আমাদের দেখা তথ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার করে পারস্পরিক সম্পর্কগুলো নির্ণয়ের সাফল্যটিকেই সে রকম পরিমাপের একটি মাপকাঠি হিসাবে ধরা যায়। এতে ০% তথ্য কাজে লাগলে বুদ্ধিকেও শূন্য ধরে শতকরা যত বেশি হারে তথ্যকে কাজে লাগানো যায় ততই বুদ্ধি অধিক বলে একটি স্কেল তৈরি করা হয়তো যায়, যদিও বাস্তবে সেটি করা কঠিন হতে পারে।

আই কিউর পরিমাপ বাস্তব দিক থেকে সহজ, তাই মোটেই নিখুত না হওয়া সত্ত্বেও সেটিই সর্বত্র ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। এতে মূলত বুদ্ধির কিছু প্রকাশ থেকে মানসিক বয়সের একটি পরিমাপ সৃষ্টি করে শারীরিক বয়সের সঙ্গে তার অনুপাতটিকেই আই কিউ বা বুদ্ধিমত্তার অনুপাত হিসাবে ব্যবহার করা হতো– সেভাবেই নামটি এসেছে।

এখন আধুনিক পদ্ধতিতে অবশ্য নিয়ম হলো একটি জনসংখ্যার মধ্যে নানা মানুষের বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে একজন বিশেষ ব্যক্তিকে শতকরা কোন অংশের মধ্যে ফেলা যাবে (যেমন উচ্চতম ৫ শতাংশের মধ্যে) তা নির্ণয় করা। এরপর ঐ জনসংখ্যার মধ্যে সংখ্যাতত্ত্বের স্বাভাবিক (গাউশিয়ান) বন্টন মেনে বুদ্ধিমত্তার বন্টন হলে ঐ অংশের মানুষরা (এক্ষেত্রে উচ্চতম ৫ শতাংশের) কী রকম বুদ্ধিমান হওয়ার কথা এই উভয়ের তুলনা থেকে আই কিউ হিসাব করা। আই কিউ মাপতে কোন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের উপর নির্ভর করা হয় না, বরং সাধারণ বিচারবুদ্ধি কী রকম রয়েছে সেগুলোই দেখা হয়। যেমন এর প্রাথমিক যাচাই এর মধ্যে রয়েছে কোন ছবি, লেখা কিংবা ওরকম কিছু দেখিয়ে এদের মধ্যে কোনটিতে কোন জিনিসটি নেই, সবগুলোর মধ্যে কোনটি রয়েছে, কোন জিনিসটি আলাদা, সেটি কীভাবে আলাদা– ইত্যাদি নির্ণয় করতে দেয়া হয়। এভাবে নানা জিনিসের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতাগুলো পরীক্ষা করা হয়।

এখন প্রায় সবাই স্বীকার করেন যে আই কিউ দিয়ে যে ভাবে বুদ্ধি মাপা হয় তা কোন কোন ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়। একে বড় জোর বুদ্ধিমান আচরণের একটি পরিমাপ বলা যায়। কারণ সৃজনশীলতার মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা এর বাইরে থেকে যায়। অপেক্ষাকৃত মামুলি আই কিউ নিয়েও একজন মানুষ উচ্চ সৃজনশীলতার অধিকারী হতে পারে। বুদ্ধির ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার গুরুত্বকে খাটো করে দেখা যায় না। এই দিকটি আমরা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

বুদ্ধিমত্তার বিবর্তন

প্রাণি জগতে বুদ্ধির পরিচয়ের কিছু নমুনা আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। কিন্তু এ পরিচয় আরো ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে খুবই অবাক হবার মত। যেমন মৌমাছি যেভাবে তার সঙ্গীদেরকে ফুলের অবস্থানের দিক ও দূরত্ব বিশেষ নাচের মাধ্যমে জানায় তাতে তার রীতিমত একজন গণিতবিদের

মত বুদ্ধির প্রয়োজন হবার কথা। সূর্যের অবস্থান থেকে নিজের অবস্থান পর্যন্ত আঁকা সরল রেখার সঙ্গে ফুলের অবস্থান থেকে নিজের অবস্থান পর্যন্ত সরল রেখা যেই কোণ করছে সেটি পরিমাপ করতে হয় মৌমাছিকে। তারপর এই কোণটির পরিমাণকে নাচের ভাষায় প্রকাশ করতে হয় শুধু ফুলের অবস্থানের দিকটি জানাতেই। তারপর এর দূরত্বের প্রসঙ্গ রয়েছে– যা নাচের বিশেষ অংশে তার নিজের গতি দিয়ে বুঝাতে হয়।

দেশান্তরী পাখি যেভাবে নির্ভুল ভাবে পথ নির্ণয় করে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে একেবারে সঠিক জায়গায় হাজির হয় তাও অনেক হিসেব নিকেশের প্রয়োজন রাখে। অনেকে একে সহজাত প্রবৃত্তি বলে উড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু এতে অতীত অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করার স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। তাছাড়া এরকম অনেক ক্ষেত্রে কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে একাধিক বিকল্প থেকে প্রাণিটিকে বেছে নিতে হয়, এবং সেই বেছে নেবার ক্ষমতা যে তার আছে তাও স্পষ্ট।

তবে প্রাণিদের ঐ বুদ্ধিমত্তার সীমাবদ্ধতাগুলোও বেশ বুঝা যায়। প্রায়শ ওদের দেখা যায় ঐ একটি কাজেই যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে, তার বাইরে অন্য কিছুতে নয়। তাদের বুদ্ধির বৈচিত্রের ভান্ডারটি খুব ছোট। কিন্তু অন্য দিকে যখন আমরা বানর, শিম্পাঞ্জি ইত্যাদি প্রাইমেটদের বুদ্ধির কথায় আসি তখন কিন্তু পরিস্থিতি বেশ বদলে যেতে দেখি। তাদের মধ্যে বিবর্তন ঘটেছে সামাজিক বুদ্ধিমত্তাকে ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে– যেখানে নিজেদের মধ্যে বুদ্ধির পাল্লা দেবার ব্যাপার রয়েছে। এজন্য তাদেরকে একে অন্যের মন পড়ার চেষ্টা করতে হয়, অন্যকে টেক্কা দিতে হয়। এ যেন বুদ্ধির এক অস্ত্র-প্রতিযোগিতা যার ফলে উভয় পক্ষের বুদ্ধি ভান্ডার ক্রমাগত উন্নততর হয়েছে, ব্যাপকতর হয়েছে। প্রাইমেটদের মধ্য দিয়ে আদি মানুষের মধ্যে এটি বিকশিত হবার কাজটি কতগুলো পর্যায়ের মাধ্যমে ঘটেছে। খুব সম্ভব মস্তিষ্কের দর্শন-কোর্টেক্সের অভূতপূর্ব উন্নয়ন দিয়ে এর শুরু হয়েছিলো। তারপর সামাজিক জীবনযাত্রা, হাতের চালনার দক্ষতা– যাকে ভাষা ক্ষমতার আদি পদক্ষেপ মনে করা হয়, শিকার করার ক্ষেত্রে প্রধানত বুদ্ধির ব্যবহার, জীবন ধারনের ক্ষেত্রে কৌশলের নানা বৈচিত্র আনয়ন- এসব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে প্রাইমেটে বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটেছে। এভাবেই অন্যান্য প্রাণিদের সীমিত ও সংকীর্ণ বুদ্ধির তুলনায় তারা এত বেশি এগিয়ে থাকতে পেরেছে। হোমো সেপিয়েন্সদের ক্ষেত্রে এরই চরম উন্নয়ন ঘটেছে। এর প্রত্যেকটি পর্যায়ে মস্তিষ্ককে বুদ্ধিমত্তার আরো অনুকূলে আসার জন্য ক্রমে আরো বড় ও জটিল হতে হয়েছে।

তার মানে অবশ্য এই নয় যে আমরা উচ্চতর বুদ্ধি অর্জন করতে গিয়ে নিম্নতর পর্যায়গুলোকে ত্যাগ করে এসেছি। যেমন সহজাত প্রবৃত্তিগুলোকেও আমাদের বুদ্ধিমত্তায় আমরা কি ব্যবহার করছিনা? বরং আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে উচ্চ থেকে নিু অনেক কিছুকে একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামের মতো স্তর-বিন্যস্ত ধাপে ধাপে প্রয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে। এই বড় প্রোগ্রামকে ভেঙ্গে ফেললে আমরা ক্রমাগত আরো ছোট থেকে ছোট প্রোগ্রাম পাই। একেবারে নিম্নতম পর্যায়ে অবশ্য সেটি নেহাত সহজাত প্রবৃত্তির মত স্বয়ংক্রিয়ভাবে করার মত জিনিসেই পর্যবেশিত হয়।

এই প্রোগ্রামের উচ্চতম পর্যায়ে আমাদের বুদ্ধি প্রয়োগের একটি প্রধান লক্ষ্য থাকে। সেটি সাধারণত আমাদের বিবর্তন লব্ধ আকাঙ্খা থেকে পাই– আমাদের পরিবেশকে বুঝার নিয়ন্ত্রণ করার এবং এই কাজে অন্যদের সহযোগিতা পাওয়ারই সেই আকাঙ্খা। আবেগেরও একটি ভূমিকা থাকে। কিন্তু এর বাস্তবায়নের জন্য আমাদেরকে কিছু ছোট আপাত-লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয়। তারপর আরো ছোট আরো নিু আপাত-লক্ষ্য, এমনি নিম্নাভিমুখি প্রোগ্রাম। শেষ পর্যন্ত নিুতম আপাত-লক্ষ্য নিয়ে যা করি তাকে সহজাত প্রবৃত্তি ছাড়া কিছু বলা যাবেনা।

একটি উদাহরণ নেয়া যাক। ধরা যাক ভুলে ভেতরে চাবি রেখেই ঘরের দরজা বন্ধ করে বাইরে চলে গেছি। এখন প্রধান লক্ষ্যটি হলো দরজাটি খুলতে হবে। এর একটি ছোট আপাত-লক্ষ্য হতে পারে জানালার কাঁচ ভেঙ্গে ছিটকিনি খোলা। তারও ছোট একটি আপাত লক্ষ্য হতে পারে ছিটকিনি খোলার জন্য একটি সাঁড়াশি যোগাড় করা। শেষ পর্যন্ত কতগুলো অভ্যস্ত সহজাত স্বংয়ক্রিয় কাজের মাধ্যমেই হয়তো নিুতম আপাত-লক্ষ্য এবং সেই সুবাদে ঐ প্রধান লক্ষ্যটি অর্জিত হবে।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) ক্ষেত্রে অথবা যে কোন কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরির ক্ষেত্রে এই রকম স্তর-বিন্যাসই অনুসরণ করা হয়। পার্থক্যটি হলো এক্ষেত্রে প্রোগ্রামটি একজন প্রোগ্রামার তৈরি করেন– এটি বিবর্তনজাত নয়। তাই এর কোন পর্যায়ে কোন আবেগ জড়িত হয়না। কিন্তু মানুষের বুদ্ধিমত্তার থেকে আবেগকে আলাদা করা যায় না, বিশেষ করে প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে।

খুব উচ্চ পর্যায়ের গণিতেও একেবারে নিম্নতম পর্যায়ের খুঁটিনাটি যোগ-বিয়োগগুলো যখন আমরা করি তখন খুব স্বয়ংক্রিয় ভাবেই করি– সহজাত

প্রবৃত্তির ভঙ্গিতে। সহজাত হবার ক্ষেত্রে মৌমাছির হিসাব করাতে ও আমাদের হিসাব করাতে তেমন কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু আমরা বাড়তি যা করতে পারি তা হলো ঐ হিসাবকেই আমরা এক যৌক্তিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অনেক উচ্চতর গণিতে নিয়ে যেতে পারি। সেখানে অনেক সাধারণীকরণের বিষয় আছে, বিমূর্ততা আছে। বিবর্তনে বৃহত্তর ও উন্নততর মস্তিষ্ক আমাদেরকে এই ক্ষমতা দিয়েছে। শুধু গণিতের ক্ষেত্রে নয়, সব ক্ষেত্রে এভাবেই আমাদের বুদ্ধিমত্তা অন্যদের থেকে পৃথক। বুদ্ধির কাজে আমরা অনন্য বটে, তবে অন্যান্য প্রাণির মত সরলতর বুদ্ধির কাজগুলোও এতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

কল্পনা ও সৃষ্টিশীলতা

কল্পনার সুযোগ সৃষ্টি

বুদ্ধিমত্তার প্রক্রিয়াটি মস্তিষ্কে কী ভাবে ঘটে তার একটি সম্ভাব্য তত্ত্ব আমরা দেখেছি। এতে অনুধাবনে আসা এক একটি বিষয়ের প্রতিনিধিত্বকারী কোড স্নায়ু প্যাটার্নের আকারে মস্তিষ্কে সৃষ্টি হয়। তাদের আশ পাশের জায়গাগুলোতে কিছু কিছু জায়গা ছেড়ে তার অনেকগুলো প্রতিলিপি বা ক্লোন মস্তিষ্কে সৃষ্টি হয়। এ ভাবে বেশ কিছু ক্লোন তৈরি হতে যথেষ্ট জায়গা লাগে। অথচ এসব ক্লোনে নানা বৈচিত্র হতে পারা এবং তাদের মধ্যে একটি সার্থক কোডিং প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই বুদ্ধির প্রকাশ ঘটে। তাই অনেক ক্লোন কলোনি গড়ে উঠার জন্য যত বেশি কার্যকর জায়গা মস্তিষ্কে পাওয়া যাবে, বুদ্ধির চর্চায় ততই সুবিধা। এ কাজের জন্য কোর্টেক্সে উন্মুক্ত জায়গা প্রয়োজন। বানর, এইপ ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান প্রাণিতে তার দৈনন্দিন আটপৌরে বুদ্ধি-চর্চার জন্য এরকম জায়গা থাকলেও প্রয়োজনের থেকে বাড়তি নাই। আর অন্য প্রাণির মধ্যেতো এটি তার চেয়েও অনেক কম। কাজেই তাদের বুদ্ধি চর্চা আরো সীমিত– বাঁচা মরার গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু এর বড় রকমের ব্যতিক্রম ঘটেছে। মানুষের মস্তিষ্কের কোর্টেক্স অন্য প্রাইমেটের তুলনায়ও অনেক বড়। দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদির জন্য রিজার্ভ করা জায়গাগুলোর বাইরে কোডিং ক্লোন কলোনির জন্য উন্মুক্ত জায়গা সেখানে অনেক বেশি রয়েছে। এটি এত বেশি যে দৈনন্দিন তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মিটিয়ে আমরা মস্তিষ্কের এই জায়গার কিছু বিলাসী ব্যবহারও করতে পারি। যেমন একটি উদাহরণ নেয়া যাক। আমরা ঘোড়াকে চিনি এবং ঘোড়াকে অনুধাবনের স্মৃতি আমাদের মস্তিষ্কে আছে। একই ভাবে বড় নানা পাখির স্মৃতিও আমাদের মস্তিষ্কে আছে। নূতন কোন অনুধাবনে যখন আমাদের মস্তিষ্কে কোডের ক্লোন কলোনি সৃষ্টি হয় তখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রাসঙ্গিক স্মৃতির সঙ্গে তা অনুরণিত হতে পারে। আমাদের ক্ষেত্রে কখনো কখনো ঘোড়া আর পাখির উভয়টির স্মৃতির সঙ্গে অনুরণিত হতে গিয়ে উভয়ের নানা উপাদান মিশিয়ে মস্তিষ্কে 'পঙ্খীরাজ ঘোড়ার' কোড সৃষ্টি হতে পারে। তখন স্মৃতির সিনাপস প্যাটার্নে উভয়টি থেকে এখানে এর এক টুকরা ওর এক টুকরা মিশিয়ে এমন ক্লোন কলোনি সৃষ্টি হতে পারে যা কোন সত্যিকার অনুধাবনেই ছিলনা। এসব করার জন্য বেশি জায়গা রয়েছে বলেই আমাদের পক্ষে এটি সম্ভব। এ

ভাবে তৈরি মিশ্র কলোনিও যথারীতি কোডিং প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারে এমনকি কলোনিগুলোর ঐকতানে প্রাধান্যও বিস্তার করতে পারে। এর একটি ফলশ্রুতি হলো ঘোড়ার দেহ আর পাখির ডানা নিয়ে উড়ন্ত পঙ্খীরাজ আমাদের বুদ্ধিজাত চিন্তায় বেশ স্থান পেয়ে যেতে পারে– চাই কি নাক দিয়ে আগুণের স্ফুলিঙ্গ বের হওয়া সহ। এটিই কল্পনা শক্তি– যা সরাসরি ইন্দ্রিয় অনুভূতিতে নাই তাকেও জ্বলজ্যান্ত করে তোলার ক্ষমতা। এটি একবার করে ফেললে মানুষ যথারীতি একে তার স্বাভাবিক চিন্তা প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসতে পারে, এ নিয়ে গল্প তৈরি করে আবেগের প্রকাশ ঘটাতে পারে, এমনকি বিমান ডিজাইনার হিসাবে প্রয়োজন হলে পঙ্খীরাজের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাস্তব ক্ষেত্রেও নূতন উদ্ভাবন করতে পারে। কল্পনা শক্তি মানুষের চিন্তাকে এই গুরুত্বপূর্ণ অনন্যতাটি দিয়ে থাকে। আর তা সম্ভব হয়েছে মূলত তার বৃহত্তর মস্তিষ্কের জন্য।

সৃষ্টিশীলতার শুরু কল্পনাতে

স্বাভাবিক ভাবে দৈনন্দিন কিছু সৃষ্টিশীলতা সকল মানুষের সহজাত। কিন্তু এর মধ্যে সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, প্রকৌশল ডিজাইন ইত্যাদিতে সৃষ্টশীলতার আরো অনেক বেশি সংস্কৃত রূপ সম্ভব হয়। এ সবকিছু শুরুটি কিন্তু কল্পনার মধ্যে। নানা স্মৃতি নানা অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে কল্পনার ইতস্তত ক্লোনিং কোড মস্তিষ্কের কোর্টেক্সে দানা বাঁধে। তাকে সৃষ্টিশীল হয়ে উঠতে হলে এক ধরনের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়। এই পরীক্ষাকে আমরা একটি ছাকনি হিসাবেও দেখতে পারি। এলোমেলো কল্পনার টুকরাগুলো যখন একটি সৌকর্যময় রূপ লাভ করতে পারে, যাকে কখনো আমরা বলি নান্দনিক, কখনো বলি সুসমঞ্জস, কখনো বলি অন্তর্নিহিত ভাবে সুন্দর, তখনই শুধু ঐ ছাকনির মধ্য দিয়ে চলে গিয়ে এটি সৃষ্টিশীল বলে বিবেচিত হতে পারে।

সব কল্পনা সৃষ্টিশীল হতে পারেনা বটে, কিন্তু সব সৃষ্টিশীলতার শুরু কিন্তু কল্পনাতেই হতে হয়। কল্পনার নিজেরও অবশ্য কিছু আবশ্যকীয় উপাদান রয়েছে। যেমন একটি নূতন মানসিক চিত্র সৃষ্টি হওয়াটাই কল্পনার প্রধান উপাদান। অতীত স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার জোড়া তালিতে এটি কীভাবে সৃষ্টি হয় তা আমরা একটু আগে দেখেছি। কিন্তু কল্পনা এই উপাদানেই সীমাবদ্ধ নয়। যে জিনিসের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত কোন স্মৃতি বা অভিজ্ঞতা আদৌ নাই তাও কল্পনায় আসতে পারে। এতে একেবারেই বাস্তবতার রেশটুকুও না থাকতে পারে, সাধারণত যাকে ফ্যানটাসির পর্যায়ে ফেলা যায়। আর এক ধরনের

উপাদান হলো বাইরের বাস্তব কোন জিনিসের উপর অন্য জিনিসের প্রতীকী সত্ত্বা আরোপ করা। সেই অন্য জিনিসটি আরেকটি বাস্তব জিনিস হতে পারে বা তার বদলে আর একটি কল্পনার জিনিসও হতে পারে। এটি যেন এক জগতের মানসিক চিন্তাকে অন্য জগতে নিয়ে গিয়ে সেখানে প্রতিস্থাপিত করা। এই উপাদান দিয়েই সঙ্গীত সৃষ্টি করে কম্পোজার হয়তো পাহাড়ি ঝরণার কলধ্বনির মাধুর্যকে নিজের সঙ্গীতের কম্পোজিশনের মধ্যে আরোপ করতে পারেন। তেমনি কল্পনার উদাহরণ দেয়া যাবে সহিত্যিকের, চিত্র শিল্পীর, স্থপতির, অথবা বিজ্ঞানীর কাজ থেকেও। তবে এই সব উদাহরণগুলো হবে সৃষ্টিশীলতার পরীক্ষায় পাশ করা সব কল্পনার। পাশ না করা কল্পনায়ও একই ভাবে এক জগতের মানসিক চিত্রটি অন্য জগতে নিয়ে যাওয়ার উপাদান থাকতে পারে। অনন্য শিল্পকর্ম বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার না হলেও আমাদের দৈনন্দিন চিন্তায় এ কল্পনার দাম রয়েছে।

স্বাভাবিক ভাবেই আগ্রহ থাকতে পারে মস্তিষ্কে নানা রকম কল্পনা কোথায় দানা বাঁধছে তা প্রত্যক্ষ ভাবে দেখতে। এখন যেহেতু মস্তিষ্ক ইমেজিং করার প্রযুক্তি আমাদের হাতেই রয়েছে, এই চেষ্টা হতেই পারে। কোন বিশেষ কিছু চিন্তা করতে দিয়ে সে অবস্থায় মস্তিষ্কের পি ই টি ইমেজিং করে এর কিছুটা ফলাফল পাওয়া গেছে। কল্পনার জিনিসগুলো যদি সাধারণ পরিচিত জিনিস হয়, অর্থাৎ যখন মানসিক চিত্রে একেবারে নূতন কিছু আনতে হয়না, তখন পি ই টি ইমেজে মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাস এলাকাকে বেশ সক্রিয় দেখা যায়। হিপোক্যাম্পাস যেহেতু স্থায়ী স্মৃতির সঙ্গে জড়িত এখানে তাই স্মৃতিকে উজ্জীবিত করার চেষ্টাটিই হয়তো মুখ্য। উদাহরণ স্বরূপ দেখা গেছে যে কোন বড় শহরে ট্যাক্সি চালক হবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য শহরের অলিগলির সঙ্গে পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণ নেবার পর ওরকম কোন জায়গায় ট্যাক্সি চালাচ্ছে এমন কল্পনা করতে দিয়ে পি ই টি ইমেজ নিলে হিপোক্যাম্পাসে সক্রিয়তা দেখা যায়।

কিন্তু সাধারণ বাস্তবতাকে অতিক্রম করা কোন কল্পনা করতে দিয়ে পি ই টি ইমেজ নেয়া হলে তখন স্পষ্ট করে মস্তিষ্কের কোন বিশেষ জায়গার সক্রিয়তা চিহ্নিত করা যায় না। তবে কিছুটা আভাস মিলেছে যে এ সময় কোর্টেক্সের সম্মুখভাগটির সক্রিয়তা মৃদুভাবে কিছুটা উঠানামা করে। এটি ভাল বুঝা যায় কবিকে কবিতা লিখতে দিয়ে বা শিল্পীকে ছবি আঁকতে দিয়ে ইমেজিং করলে।

স্নায়ু প্যাটার্নের ভাঙ্গা-গড়া থেকে হঠাৎ সৌকর্য

সাধারণ কল্পনা আর সৃষ্টিশীলতার মধ্যে পার্থক্য হলো প্রথমটি নেহাতই বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। আমার ব্যক্তিগত পরিসরে যে কোন অলীক কিছু, যে কোন ফ্যান্টাসি সৃষ্টি করার সুযোগ আমার রয়েছে, যা আমি ব্যক্তিগত চিন্তায় আনতে পারবো। কিন্তু তাকে অন্যের কাছে অনুধাবনযোগ্য ও উপভোগ্য হিসাবে উপস্থাপন করতে পারতে হলে তার মধ্যে সৃষ্টিশীলতার গুণ থাকতে হয়। তখন ব্যক্তিগত পর্যায় অতিক্রম করে এটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বা বৈজ্ঞানিক পরিমন্ডলে যাবার উপযুক্ত হয়। সেক্ষেত্রেই কোন না কোন রকমের সৌন্দর্যের, নান্দনিকতার বা সৌকর্যের পরীক্ষায় তাকে উত্তীর্ণ হতে হয়, যা আমরা আগে দেখেছি।

কিন্তু এই পরীক্ষায় মস্তিষ্কে কী ঘটে? এই ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য যে তত্ত্ব রয়েছে তা এ রকম। কল্পনা থেকে যে মানসিক ধারণাগুলো সৃষ্টি হয় মস্তিষ্কে তার প্রতিনিধিত্ব করে স্নায়ুর সিগন্যাল সক্রিয়তা। কল্পনা যখন চলতে থাকে তখন এরকম সিগন্যাল প্যাটার্নগুলো একত্র হয়ে এক একটি যৌগ প্যাটার্ন তৈরি হয়, তারপর স্বয়ংক্রিয় ভাবেই সেটি আবার ইতস্তত ভেঙ্গে যায়। এ ভাবে ভাঙ্গা গড়া চলতেই থাকে। এটি এমন একটি মৃদু পর্যায়ে চলতে থাকে যা আমাদের চেতনার বাইরে থেকে যায়। কিন্তু এই ভাঙ্গা গড়ার প্রক্রিয়ার মধ্যেই কখনো কখনো হঠাৎ করে সব কিছু যেন মুহূর্তে লয়প্রাপ্ত হয়। এক একটি প্যাটার্ন টুকরা অন্যের সঙ্গে এমন সুন্দর করে ফিট করে যায় যে তার যৌগরূপটির স্নায়ু প্যাটার্ন খুবই উচ্চকিত হয়। এটি তখন আর চেতনার অগোচরে থাকে না, আমাদের চেতনার মধ্যে একটি নান্দনিক সৌন্দর্য নিয়ে প্রতিভাত হয়। ঐ যৌগ প্যার্টানটি উচ্চকিত হবার কারণ হলো তার উপাদান প্যাটার্নগুলোর মধ্যে একটি সুমঞ্জস বন্ধন সৃষ্টি হওয়া– আর সেটিই হলো নান্দনিকতা।

সৃষ্টিশীলতার ঘটনাগুলো প্রায়শ এরকম হঠাৎ করে ঘটে থাকে। অনেক সময় দীর্ঘ সময় ধরে একটি আইডিয়া এভাবে ঘুরপাক খায় কিন্তু সৃষ্টিশীলতার চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার সৌভাগ্য তার হয়না। ফলে সার্থক হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকলেও সেটি ঠিক সার্থক হয়ে উঠেনা। কিন্তু একদিন হঠাৎ করে ঐ ঘটনাটি ঘটে, যাকে একটি অন্তর্দৃষ্টি লাভের মতই ঘটনা বলা যায়। এ সম্পর্কে একটি ধারণা হলো ঐ ভাঙ্গাগড়ার প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট টানা পোড়েন সৃষ্টিও করে। ফলে একটানা চলতে থাকলে সেটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভের সম্ভাবনাটি কঠিন হয়ে যায়। এ কারণে মস্তিষ্ক কল্পনা নিয়ে অনেক্ষণ খুব সক্রিয় থাকার পর

নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেয়। আবার পরে হয়তো সেই নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। অনেক সময় ঐ নিয়ন্ত্রণহীন ছেড়ে দেয়া বিশ্রামের সময়টুকুতেই টানাপোড়েন মুক্ত অবস্থায় ঐ অন্তর্দৃষ্টিটি দেখা দেবার সুযোগ পায়। এরকম অনেক ক্ষেত্রে ঘটেছে যেখানে চেষ্টা করার সময় নয়, বরং বিশ্রামে থাকার সময় সমাধান এসেছে।

রসায়নবিদ কেকুলে বেনজিনের রাসায়নিক গঠনটি ঠিক নির্ণয় করতে পারছিলেন না। এ সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণায় তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন কিন্তু শেষটুকু মিলাতে পারছিলেননা কিছুতেই। ঐ সময়ে হঠাৎ করে স্বপ্নে দেখলেন যে ছয়টি বানর একের লেজ অপরের হাতে ধরে ষড়ভূজ গঠন করছে নাচতে নাচতে। ঘুম থেকে উঠেই তিনি বেনজিন রিং এর সেই বিখ্যাত ষড়ভূজ গঠনটি এঁকে ফেললেন। স্পষ্টত আবিষ্কারটি তাঁর মাথায় প্রায় তৈরি হয়ে ছিল। কিন্তু স্নায়ু প্যাটার্নের ভাঙ্গাগড়ার টানাপোড়ানে প্রকাশিত হতে পারছিলনা। ঘুমের প্রশান্তির মধ্যে স্বপ্নের অবচেতনে তাই এটি চূড়ান্ত সৃষ্টিশীলতায় রূপ পেতে পেরেছে।

ভাষা ঃ মানব চিন্তার ভিত্তি

ভাষার ভূমিকা

ভাষার কাজ কী, এই প্রশ্ন উঠলে সঙ্গে সঙ্গে হয়তো উত্তর আসবে দুই বা ততোধিক মানুষের মধ্যে যোগাযোগের সাধারণ মাধ্যম হওয়াটাই তার কাজ। তবে একটু গভীরভাবে দেখলে বুঝা যাবে এটিই ভাষার একমাত্র কাজ নয়। অত্যন্ত চিন্তাশীল জীব হিসাবে মানুষের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো নিজের ও অপরের আভ্যন্তরীন চেতনাগুলোকে সামাজিক প্রয়োজনে ধারণ করা। এটি পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের চেয়ে আরো অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জ, যা ভাষার মাধ্যমে মানুষ গ্রহণ করতে পেরেছে। আসলে মানুষ যে নিজেকে মানুষ হিসেবে অনুভব করতে পারে সেটি ভাষার কারণেই।

দেখা যাক সে রকম নানা প্রয়োজনে ভাষার ভূমিকাগুলো কী? যোগাযোগের সাধারণ মাধ্যম হওয়াটা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবশ্যই। তারপর রয়েছে বর্ণনার মাধ্যমে শেখার সুযোগ। অনেক প্রাণিই নিজেদের এক জনের কাছ থেকে অন্যে শেখে। যেমন বেড়ালের বাচ্চা মাকে শিকার করতে দেখে নিজেও শেখে, ছোট বেলায় শিকারের মত করে খেলা খেলে- ঐ শেখার জন্যই। কিন্তু বেড়াল মা শিকারের খুটিনাটির বর্ণনা করে বাচ্চাকে তা শেখাতে পারে না, মানুষ যা পারে। এটি অন্য কোন প্রাণিই পারেনা। পিঁপড়ারা নিজেদের খাদ্যের জন্য তাদের গর্তের বাসায় ফাঙ্গাসের চাষ করে। এই ফাঙ্গাস চাষের পাঁচটি বিভিন্ন পদ্ধতি এখন তাদের কাছে আছে। এগুলো সব পিপড়ার কাছে ব্যাপ্তি পেতে চার কোটি বছর লেগেছে– প্রযুক্তি প্রচারের কোন বর্ণনা ভিত্তিক উপায় তাদের ছিলনা বলেই এই বিলম্ব। অপরদিকে মানুষ কৃষি উদ্ভাবন করেছে হাজার ছয়েক বছর আগে। অপেক্ষাকৃত এই অল্প সময়ের মধ্যেই কৃষির কৌশল দুনিয়ার প্রায় সকল মানুষের কাছে বিস্তৃত হতে পেরেছে। ভাষায় বর্ণনার মাধ্যমে এই দ্রুত বিস্তার সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয়, মানুষের যত চিন্তা, বুদ্ধি, কল্পনা, সৃষ্টিশীলতা, সবই তার ভাষার তাঁতে বোনা। বিশেষ করে ভাষাই মানুষকে উচ্চতর চিন্তা, বিমূর্ত চিন্তার সুযোগ করে দিয়েছে। এসবের যে কোনটি থেকে ভাষাকে বাদ দেয়ার চেষ্টা করে দেখা যাক– কাজটি তখন আর সম্ভবপর হবে না। মানুষ যে সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প সৌকর্য, নান্দনিকতা ইত্যাদি সৃষ্টি করে নিজেদের জীবনের জন্য উচ্চতর একটি অর্থ দিতে পেরেছে, তার মূলে ভাষার অপরিহার্যতাটি দেখলে ভাষার স্যতিকার ভূমিকাটি আমরা

বুঝতে পারি। এ সবের মৌলিক পর্যায়ে অপরের চিন্তাকে নিজের চিন্তায় আনার যে উচ্চ ক্ষমতা মানুষের রয়েছে তা তার ভাষার কারণেই সম্ভব হয়েছে। এ ক্ষমতা খানিকটা অন্য প্রাইমেটদের মধ্যেও রয়েছে বিশেষ করে বড় এইপদের মধ্যে। কিন্তু ভাষার অভাবে সেটি তাদের মধ্যে খুব সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তেমনি ভাষার অভাবে তাদের মধ্যে অতি সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে আত্ম-অনুভবের ক্ষমতা। আত্ম-অনুভবই মানুষের চিন্তা চেতনাকে অন্য সবার কাছ থেকে অনেক উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে দিয়েছি।

অন্য প্রাণিতে ভাষা

সাম্প্রতিক নানা গবেষণা প্রমাণ করেছে সত্যিকারের যে ভাষা, যা বাচন ক্ষমতার সঙ্গে বিবর্তিত হতে পেরেছে তা আমাদের মানব প্রজাতি অর্থাৎ হোমো সেপিয়েন্সদের মধ্যেই সম্ভব হয়েছে। আমাদের অনেক সদৃশ কিন্তু ভিন্নতর মানব প্রজাতি নিয়ানডার্থালদের মধ্যে এক ধরনের প্রাক্-ভাষা থাকার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেলেও ঠিক ভাষা ছিলনা। এর আগের হোমো ইরেকটাস এবং তারও আগের আর কোন মানব-সদৃশদের ক্ষেত্রে ভাষার এইটুকুও ছিলনা। যা ছিল সেটি ভাষা সৃষ্টির পথে একটি ধারাবাহিক বিবর্তন প্রক্রিয়া– যার কিছু নমুনা আজকের প্রাইমেটদের মধ্যেও দেখা যায়।

যেমন আজকের ভেরভেট বানরের কথাই ধরা যাক। তাদের মধ্যে তিনটি সতর্ক ধ্বনি রয়েছে– একটি তারা সাপ দেখলে ব্যবহার করে, একটি চিতাবাঘ দেখলে, অন্যটি ঈগল দেখলে। এই তিন হিংস্র প্রাণিকে তারা ভয় করে। স্পষ্টত এই তিনটি ধ্বনির প্রত্যেকটির সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে এবং সেটি শুনলে তারা বিশেষ এক রকম আচরণ করে, অন্য কোন আচরণ নয়। মনে করা হয় অত্যন্ত যান্ত্রিক ভাবে ওরা এই তিনটি ধ্বনি তিন ক্ষেত্রে ব্যবহার করে, তার মধ্যে কোন নমনীয়তা নাই। কিন্তু কিছু কিছু পর্যবেক্ষণ সে ধারণা ভুল বলে প্রমাণ করেছে। যেমন ঈগল একেবারে ছোঁ মারার অবস্থায় আসার পর তা জানতে পারলে ভেরভেট বানর লুকাবার জন্য ঈগলের ধ্বনি না দিয়ে বরং পালাবার জন্য চিতাবাঘের সতর্ক ধ্বনি দিয়েছে, কারণ ও সময় আর লুকাবার সুযোগ ছিলনা। এটি যদি সত্য হয় তা হলে ভেরভেট বানরের এই সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থার মধ্যেও ভাষার কিছু গুণ রয়েছে বৈ কি।

সাম্প্রতিক কালে বেশ কয়েকটি শিম্পাঞ্জি ও গরিলা যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছে তাদেরকে মুক-বধিরদের জন্য ব্যবহৃত ইশারার ভাষা অল্প কিছু শেখানো সম্ভব

হয়েছে বলে। এতে তারা বিভিন্ন ইশারায় তৈরি এক একটি ভাব বুঝতে শিখেছে এমনকি রীতিমত এক একটি বাক্যও। শব্দের এদিক ওদিক করে বাক্যকে পরিবর্তন করলে সেই পরিবর্তিত ভাবটিও তারা বুঝতে পারে। যদি বলা হয় 'শোয়ার ঘরে গিয়ে বলটি এনে রোজীকে দাও'– তাহলে শিম্পাঞ্জি ঠিক তাই করে, তার সামনে যে বলটি রয়েছে সেটি দেয়না। এসব থেকে মনে হয়েছে শিম্পাঞ্জি বা গরিলার ভাষা বুঝার কিছুটা ক্ষমতা রয়েছে যদিও তা খুবই সরল ক্ষেত্রে সীমিত।

হাতের কুশলতা ভাষার পূর্বসূরি

অন্য দিকে গত নব্বইএর দশকের আরো একটি আবিষ্কার ভাষার বিবর্তন বুঝতে খুব সহায়ক হয়েছে। দেখা গেছে যে শিম্পাঞ্জির মিরর নিউরন রয়েছে এর কোর্টেক্সে F5 নামক অংশ। অন্যকে অঙ্গ-ভঙ্গি করতে দেখলে শিম্পাঞ্জি যে মিরর নিউরোনের কারণে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই প্রায় অনুকরণ করতে পারে তা

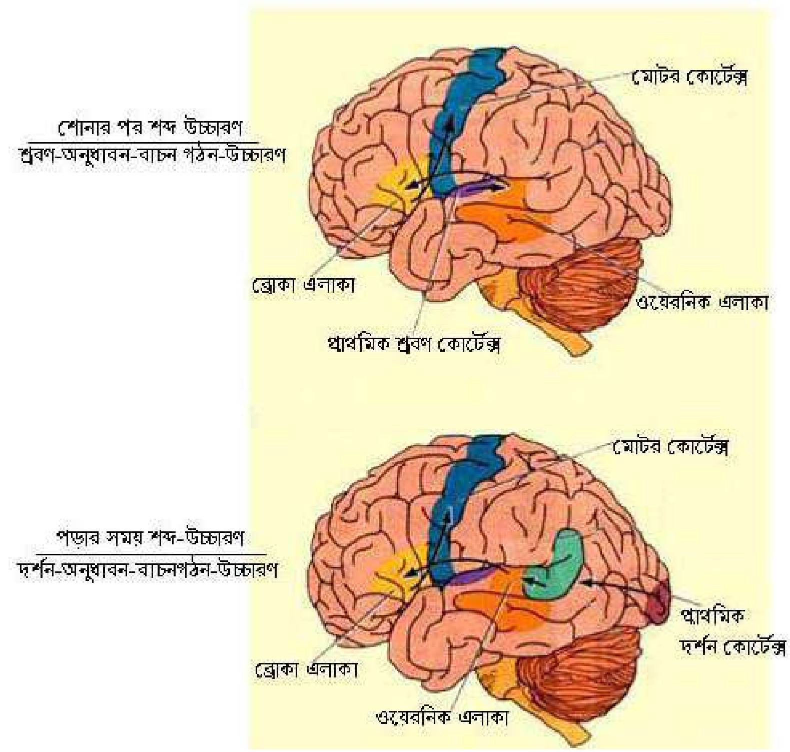

চোখ আর মস্তিষ্ক একযোগে দৃষ্টির বোধগুলো দেয়

আমরা অগেই দেখেছি। দেখা গেছে ঐ F5 অংশের সঙ্গে মানুষের মস্তিষ্কের ব্রোকা অঞ্চল প্রায় অভিন্ন– যেই ব্রোকা অঞ্চল বাচন ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এর থেকে মনে হচ্ছে প্রাইমেটদের ক্ষেত্রে এমনকি আগেকার মানব সদৃশদের ক্ষেত্রে যা ছিল অঙ্গভঙ্গির ক্ষমতা তাই মানুষের মধ্যে বাচন ক্ষমতায় বিবর্তিত হয়েছে। ভাষার সৃষ্টি খুব সম্ভব এই পথেই হয়েছে– প্রথমে অঙ্গ চালনার উপর সূক্ষ্মতর নিয়ন্ত্রণ, যে রকম নিয়ন্ত্রণ ভাল হাতিয়ার তৈরিতে দরকার রয়েছে। তারপর বাচনের উপর সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণে ভাষা এসেছে। সম্প্রতি এ ধরনের প্রাচীন মানুষের হাতিয়ার তৈরি করতে দিয়ে ঐ সময় নির্মাণকারীর মস্তিষ্কের এম আর আই ইমেজিং করা হয়েছে। দেখা গেছে তাতে মস্তিষ্কের বাম গোলার্ধে ব্রোকা এলাকা যেখানে রয়েছে, ডান গোলার্ধে ঠিক সমতুল্য একটি এলাকাই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এটি যে সমতুল্য তা বুঝা গিয়েছে কখনো ব্রোকা এলাকা নষ্ট বলে এটিই ব্রোকা এলাকার কাজ অর্থাৎ বাচনের নিয়ন্ত্রণের কাজটি নিজের করে নেয় বলে। অর্থাৎ হাতিয়ার তৈরিটির ক্ষমতা যে কথা বলার ক্ষমতার এক রকম সদৃশ এতে তাই প্রমাণিত হয়েছে।

এ সবের ফলে ২০০২ সাল নাগাদ ভাষা বিবর্তনের একটি সফল তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে যা ক্রমেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেখা গেছে যে প্রাইমেটের হাত চালনা অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। ভাষায় যে রকম কর্তা, ক্রিয়া এবং যাকে উদ্দেশ্য করে ক্রিয়াটি করা হয় সেই কর্ম থাকে এ ক্ষেত্রেও অনেকটা তার অনুরূপ হাত সঞ্চালনকারী, সঞ্চালন ক্রিয়া, এবং যার উদ্দেশ্যে এটি করা হচ্ছে তা সুনির্দিষ্ট থাকে। এই তিনটি সম্পর্কেই তথ্য ঐ সঞ্চালনের মধ্যে পাওয়া যায়। সেদিক থেকে এর মধ্যেও একটি ব্যাকরণ রয়েছে এমন বলা যায়। আমাদের যে ভাষা এর তিনটি আবশ্যকীয় গুণ রয়েছে। প্রথমটিকে বলা যায় প্রতীকিকরণ। এর মানে বিভিন্ন কাজ, বস্তু, ধারণা ইত্যাদি বুঝাবার জন্য এতে সুনির্দিষ্ট এক একটি প্রতীক থাকবে– যেমন এক একটি শব্দই এক একটি জিনিসের প্রতীক হতে পারে। এটি নেহাতই প্রতীক মাত্র। কিসের জন্য কোনটি ব্যবহার করছি সেটি এক এক ভাষায় এক এক ভাবে কিছুটা বিনা যুক্তিতেই ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু একবার ঠিক হবার পর সবাই একেই ঐ জিনিসের প্রতীক হিসাবে জেনে নেয়। দ্বিতীয় গুণটি হলো ভাষার উদ্দেশ্যমূলকতা। আমরা যখন কোন শব্দ বা বাক্য বলি তখন শ্রোতার মনে বিশেষ কিছু ভাব বা প্রভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তা বলি। এরকম উদ্দেশ্য ছাড়া ভাষা হয়না। তৃতীয় গুণটি হলো বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের মধ্যেই বুঝার সমতা, যাকে প্যারিটি বা প্রতিসাম্য বলা হয়। বক্তা একটি শব্দ

বা বাক্য যেই অর্থে বলেছে শ্রোতাও সেই অর্থেই একে বুঝবে এর নিশ্চয়তাই হলো সেই প্রতিসাম্য। নূতন তত্ত্বটি বলছে ভাষার এই গুণগুলো কিছু পরিমাণে হলেও শিম্পাঞ্জির ঐ হস্ত-সঞ্চালনের মাধ্যমে যোগাযোগের ভেতরও রয়েছে। ওখানেও প্রতীকিকরণের আভাস আছে, উদ্দেশ্যমূলকতা আছে, এবং প্রতিসাম্যও আছে।

অতি সম্প্রতি ডিএনএ এর মধ্যে নানা জিন উদ্ঘাটনেও এই সাদৃশ্যের সমর্থন মিলছে। আমাদের FOX P-2 নামের একটি জিন পরিবর্তিত হলে মুখমণ্ডলের পেশি নড়াচড়ায় ও সে কারণে শব্দ গঠনে ব্যাঘাত ঘটে, মস্তিষ্কে এসবের নিয়ন্ত্রণকারী অংশে জিনটির প্রভাবের কারণে। অন্যান্য মেরুদণ্ডি প্রাণির ক্ষেত্রে ঐ জিনটির পরিবর্তন ব্যাঘাত ঘটায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়ার ক্ষেত্রে। কাজেই ভাষার সঙ্গে অঙ্গ সঞ্চালনের সাদৃশ্য এখানেও দেখা যাচ্ছে।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রাইমেট বিবর্তনের ইতিহাসে কোটি কোটি বছর ধরে ভাষা সৃষ্টির ধাপগুলোকে এভাবে দেখা যায়। প্রথম ধাপ ছিল হাতে মুঠ করে কিছু ধরতে পারা যা বানর সদৃশ আদি প্রাইমেটেই প্রথম দেখা গিয়েছিল। মস্তিষ্কে মিরর নিউরোনের ফলে তারা অন্যের দেখাদেখি মুঠ খুলতে বাঁধতে পারে। এরপর সব দিকেই প্রথমে হাতের সরল অঙ্গ ভঙ্গি ও তারপর জটিলতর অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন– এগুলোই ভাষা-সদৃশ কাজ। এরকম সঞ্চালন দুই ভাবে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। প্রথমত লক্ষ্যনিষ্ঠ ভাবে হাত সঞ্চালন করে- কোন বাস্তব কাজের উদ্দেশ্যে। যেমন কোন কিছু ধরতে, দর্শক এটি দেখে উদ্দেশ্যটি জানবে, এই ক্ষেত্রে ধরাটাই উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত ওরকম কোন বাস্তব কাজের লক্ষ্য ছাড়াই এটি শুধু অঙ্গভঙ্গি মাত্র করে, অনেকটা মূকাভিনয়ের মত। কাজ না হওয়া সত্ত্বেও এটি দর্শককে তার অনুরূপ কাজের উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবাবে।

ঐ ধাপগুলোর ধারাবাহিকতায় অবশেষে হোমো সেপিয়েন্স মানুষের মধ্যে এসেছে কথা বলার ক্ষমতা আর সেখান থেকে ভাষা। এর আগে হস্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে ভাষার অন্যান্য দিকগুলো যেটুকু তৈরি হয়ে চলছিল বাচনের মাধ্যমে তা সত্যিকার ভাষার রূপ পেয়েছে। কিন্তু মুখের কথা ভাষার যোগাযোগের অনেকখানি দায়িত্ব নিলেও মানুষের ক্ষেত্রেও কিন্তু হাতের ইশারার ভূমিকা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। সেটি বুঝা যায় যখন মূক বধিরদের ক্ষেত্রে যোগাযোগের দায়িত্ব ইশারার ভাষায় সহজেই নিয়ে নেয়া যায়। এমনিতেও অনেক মানুষ মুখের কথার সঙ্গে হাতের সঞ্চালনকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

এমনকি অন্ধরা যারা নিজের হাতের সেই সঞ্চালনকে দেখেনা তারাও কথা বলার সময় এটি করে থাকে।

যে ব্যাকরণ বিবর্তন থেকে এসেছে

যে ভাবে আমরা হাতের অঙ্গ ভঙ্গি সূত্রে আমাদের প্রাইমেট পূর্বসূরিদের থেকে ভাষা পেয়েছি তাতে ভাষার অনেকখানিই যে আমাদের ডিএনএতেই গ্রথিত থাকবে তা বিচিত্র নয়। অর্থাৎ আমরা যখন কোন ভাষা শুনে, বলে ও অন্য ভাবে শিখি সেই শেখাই আমাদের ভাষা অর্জনে সব কিছু নয়। ভাষার কিছু মৌলিক উপাদান ডিএনএ থেকে পেয়ে আমাদের মস্তিষ্কে গাঁথা হয়ে আছে সেই মায়ের গর্ভে ভ্রূণ অবস্থা থেকেই। ভাষাবিদ চোমস্কি গত পঞ্চাশের দশকেই অন্য সব যুক্তি থেকে এরকম তত্ত্ব দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে যত হাজার হাজার ভাষাই মানুষের থাকুক না কেন, তাদের ব্যাকরণের আপাত যত ভিন্নতাই থাকুক না কেন, সব মানুষের মস্তিস্কে কিন্তু একটি সার্বজনীন ব্যাকরণ (ইউনিভার্শাল গ্রামার) গ্রথিত হয়ে আছে বিবর্তন সূত্রেই। দুনিয়ার হাজারো ভাষার সবগুলোর ব্যাকরণকে এই বিশ্ব-ব্যাকরণের নিয়ম অবশ্যই মেনে চলতে হয়, তার আওতাধীন থাকতে হয়, কারণ ওটি যে আমাদের মানব সত্ত্বার সঙ্গেই জড়িত। এখন আমরা জানি আমাদের পূর্বসূরিদের যাদের ভাষা ছিলনা তাদেরও হাত সঞ্চালনের সেই ছিটেফোটা ব্যাকরণের মধ্যে এই সার্বজনীন ব্যাকরণের বীজ সুপ্ত ছিল। চোমস্কি অবশ্য এই তত্ত্বটি দিয়েছিলেন দুটি জিনিস লক্ষ্য করে। প্রথমত তিনি দেখলেন– যে কোন ভাষায় সীমিত কিছু সংখ্যক মাত্র শব্দ দিয়ে অসীম সংখ্যক বাক্য তৈরি সম্ভব। যে কেউ এমন বাক্যও তৈরি করতে পারবে যেগুলো এর আগে কখনো কেউ তৈরি করেনি। মানুষের নিজের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত ব্যাকরণ না থাকলে পূর্ব দৃষ্টান্ত ছাড়া এরকম নূতন বাক্য তৈরি সম্ভব হতো না। দ্বিতীয়ত তিনি লক্ষ্য করলেন যে ছোট্ট শিশুরাও শুদ্ধ বাক্য সহজাত ভাবে তৈরি করতে পারে– যে বাক্য কখনো সে শোনেনি তাও। এ যেন তার জানা শব্দগুলো কী ভাবে সাজিয়ে দিলে তা বাক্য হবে, ভাব প্রকাশ করবে, তা সে সহজাত ভাবেই বুঝে। ঐ সার্বজনীন ব্যাকরণ জন্ম থেকেই তাদের মাথায় তার-বাঁধা হয়ে আছে বলেই এটি সম্ভব হয়। আমরা একটু ভাবলেই দেখবো যত রকমের ভাষাই হোক– এমন কি একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা প্রত্যন্ত কোন গোষ্ঠির ক্ষুদ্র উপজাতীয় ভাষাতেও ব্যাকরণের মূল কাঠামো কিন্তু একই। কর্তা, ক্রিয়া, কর্ম অবশ্যই সেখানে একই গুরুত্ব নিয়ে থাকবে। বাক্যে কোনটি

আগে বা কোনটি পরে আসবে তা এক ভাষার সঙ্গে অন্যটির না মিলতে পারে। কিন্তু আসলে সব ভাষাই কাজ করে একই সার্বজনীন ব্যাকরণের আওতায়।

প্রশ্ন উঠতে পারে ভাষার কোন অংশকে যদি এভাবে সার্বজনীন রূপে মস্তিষ্কেই বংশানুক্রমে গ্রথিত করে দেয়া যায় তা হলে পুরো একটি সার্বজনীন ভাষাই সে ভাবে গ্রথিত হলোনা কেন? তা হলে তো এত রকম ভাষা সৃষ্টি হতো না– আর কোন ভাষাই কষ্ট করে শিখতে হতো না– সহজাত ভাবেই ঐ সার্বজনীন ভাষা আমরা সবাই জানতাম। এটি যে হয়নি তার কারণ বিবর্তনের জন্য কাজটি সুবিধাজনক হতো না, ভাষার জন্যও নয়। ভাষা মাত্রেরই দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে– একটি হলো তার শব্দ ভাণ্ডার, অন্যটি হলো তার ব্যাকরণ। শব্দ ভাণ্ডার একটি ব্যাপক ব্যাপার, এটিই ঐ ভাষার পুরো অভিধান। একে যদি আমাদের ডিএনএর মধ্যে সংরক্ষিত করতে হতো তা হলে সেখানকার অনেকখানি জায়গা এটি দখল করে রাখতো। অন্য এত সব জেনেটিক বার্তা যেখানে রাখতে হয় তার জন্য ব্যাপারটি সুবিধাজনক হতো না। তাছাড়া মস্তিষ্কের স্মৃতিতেও এটি গোড়া থেকেই অনেকখানি জায়গা দখল করে রাখতো। তাই শব্দগুলোকে নয় বরং শব্দ কীভাবে গড়তে হয় সেই মৌলিক নিয়মগুলোই শুধু আমাদের জেনেটিক ব্যবস্থায় সংরক্ষণ করাটাই অনেক ভাল। এতে পরে প্রয়োজনমতো নূতন নূতন শব্দ গড়ার সুযোগটিও খোলা থাকছে। একই ভাবে পুরো ব্যাকরণটি সেখানে রাখলেও অনেক জায়গা প্রয়োজন হতো। তার বদলে শুধু সার্বজনীন কিছু মূল নিয়ম এতে গ্রথিত করে রাখা হয়েছে। এর সাহায্যে এক এক ভাষায় তার নিজস্ব বিস্তারিত ব্যাকরণ তৈরি করে নেয়া যায়, আবার শব্দ ভান্ডারও সৃষ্টি করা যায়। ব্যাকরণের ঐ মূল নিয়মের অংশটুকুই বিবর্তন সৃষ্ট মস্তিষ্কের সার্বজনীন ব্যাকরণ। বিবর্তন সব সময় অধিক দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে চায় বলে এমনটি হয়েছে।

ছোট শিশুদের ভাষা শেখা

ছোট শিশুরা শুনতে শুনতে ভাষা শেখে। এভাবে যা শেখে নিজের সার্বজনীন ব্যাকরণে তা সাজিয়ে নেয়। এই শেখার জন্য তাকে একেবারে শৈশবেই কতগুলো সক্ষমতা অর্জন করতে হয়, যা ভাষার মৌলিক গুণের সঙ্গে জড়িত। আসলে শিশুদের ভাষা শেখা পর্যবেক্ষণ করে আমরা ভাষার গুণাগুণ সম্পর্কেই অনেক কিছু উদ্ঘাটন করতে পারছি, যেমন চোমস্কি সার্বজনীন ব্যাকরণের ধারণা এভাবেই আবিষ্কার করেছিলেন। শুনে শুনে শেখার সময় শিশুকে যে সক্ষমতা অর্জন করতে হয় তার কিছু হচ্ছে ভাষাগত। মাতৃভাষাই হোক কিংবা

অন্য ভাষাই হোক যে ভাষায় সে অভ্যস্ত হচ্ছে তার ভাষাগত কিছু মৌলিক নিয়ম সে আয়ত্ব করে– যেমন একবচন থেকে বহুবচন কেমন করে গড়া যায়, একটি কাজ আমি করলে কী ভাবে বলতে হবে, অন্যে করলে কীভাবে বলতে হবে, ইত্যাদি। এখানে যে সক্ষমতার প্রয়োজন রয়েছে তা বুঝা যায় শিশুকে ওতে ভুল করতে দেখে, যেমন 'বইগুলো' না বলে 'বইরা' যখন বলে। অথবা 'আমি করছি' না বলে 'আমি করছে' বলে। ভুল করলেও শিগ্‌গির সে নিজেই বুঝে যে ওটা ভুল হচ্ছে। তবে ভাষার অধিকারী হবার জন্য শিশুকে শুধু ভাষাগত কিছু সক্ষমতা অর্জন করলেই চলেনা, ভাষার অন্যান্য গুণের সঙ্গে জড়িত সক্ষমতাও অর্জন করতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে অন্যের মন বুঝার ক্ষমতা– যেমন সে যা বলছে শ্রোতা তাকে কী বুঝছে সেটি আন্দাজ করতে পারা। এমনকি সে যদি সংক্ষেপে বলে 'মা, গাড়ি' তখন বলার আগেই সে চিন্তা করে এর মাধ্যমে যে সে তার খেলনা গাড়িটি দিতে বলছে তা মা বুঝবে কিনা। এভাবে তাকে সামাজিক যোগাযোগের সক্ষমতা গড়ে তুলতে হয়। যখন থেকে সে ভাষার ব্যবহার শিখছে তখন থেকে শিশু সামাজিক মানুষ। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে কিছু সম্পন্ন করার মূল্য তখন সে বুঝে, ভাষা দিয়ে অন্যদের মনোযোগ ও সহযোগিতা আকর্ষণে সে সক্ষম।

শিশুর ভাষা শেখার প্রক্রিয়াটি আসলে এক বছর বয়সের আগেই শুরু হয়ে যায়। খুব ছোট শিশুর ক্ষেত্রে ইমেজিং ও অন্যান্য গবেষণা থেকে দেখা গেছে ৮/৯ মাস বয়সেই তার মস্তিষ্কে ভাষা অঞ্চল তৈরি হয়ে যায়। ঐ সময়ই সে

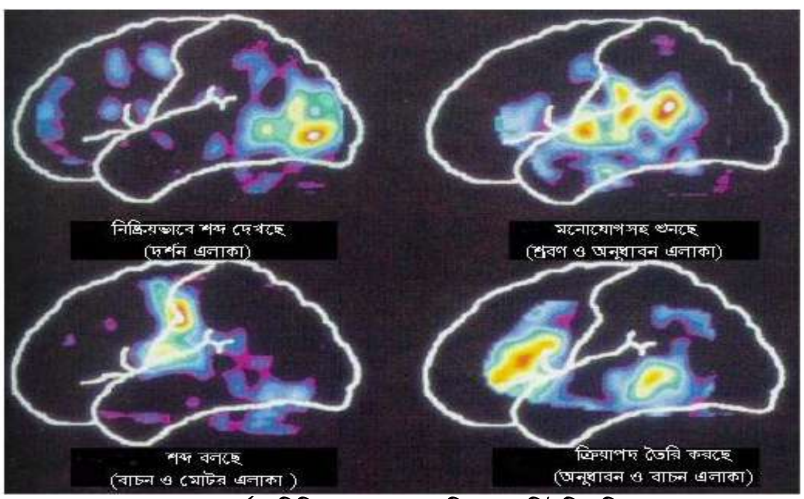

ভাষা চর্চার বিভিন্ন কাজে রত মস্ড়িষ্কেও পিইটি ছবি
প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন অঞ্চল সক্রিয় হচ্ছে

মাতৃভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠে (মা-বাবা ও ঘনিষ্ঠ পরিবেশে সবাই যে ভাষায় কথা বলে)। অন্য কোন ভাষার শব্দ শুনলে বুঝতে পারে যে এটি ভিন্ন কিছু। দুই বছর বয়সের কাছাকাছি গিয়ে তার মস্তিষ্কে সিনাপ্‌স ঘনত্ব খুবই দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। ফলে স্মৃতির সংরক্ষণ ব্যবস্থা অনেক বাড়ে, তথ্য প্রসেসিং এর জায়গাও অনেক বাড়ে। এ সময় শব্দ ভান্ডার ও ব্যাকরণের সম্প্রসারণে রীতিমত একটি বিস্ফোরণ ঘটে। এ বিস্ফোরণ চার বছর বয়সে তুঙ্গে উঠলেও এর রেশ পাঁচ ছয় বছর বয়স পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এ সময় পর্যন্ত শিশুকে যে কোন ভাষার পরিবেশে রাখলে সে প্রায় মাতৃভাষার মতই সহজাত ভাবে সে ভাষা শিখতে পারে। একই সঙ্গে একাধিক ভাষাও সে এভাবে শিখতে পারে। কিন্তু এই ক্ষমতা ঐ বয়সের পর পর শেষ হয়ে যায়। এর পর কোন ভাষা শিখতে হলে অন্য সব জিনিস শেখার মত স্বাভাবিক শেখার পদ্ধতির মধ্য দিয়েই শিখতে হবে।

শিশুদের ভাষা শিক্ষার একেবারে শুরুর দিক সম্পর্কে সাম্প্রতিক একটি তত্ত্ব হলো, এটি সম্ভব হয়ে উঠে যখন মস্তিষ্কের অনুভূতি ও মোটর অঞ্চলগুলো এমন উন্নত হয় যে শিশু তার পরিবেশের উপর কিছুটা কাজ করতে সক্ষম হয়। তখনই কর্তা, ক্রিয়া, কর্মের সমন্বয়ে বাক্য গঠনের নিয়মগুলো তার কাছে প্রতিভাত হয়ে উঠে, এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। শ্রোতা কী বুঝছে তা নিয়েও সে ভাবতে পারে। ৮/৯ মাস বয়স থেকেই হয়তো তার এ চেষ্টা শুরু হয়ে যায়।

ভাষা ও আপন-চিন্তা

ভাষা শুধু অন্যের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে নয়, এটি নিজের সঙ্গেও যোগাযোগের উপায়। আমার নিজের মধ্যে যে চিন্তাস্রোত চলছে তারও একটি বাহনের অস্তিত্ব আমি অনুভব করি, যা আমার প্রতি মুহূর্তের পরিস্থিতিকে নিজের মধ্যে প্রকাশ করে চলছে। কখনো এটি সেই পরিস্থিতির নানা টুকরাগুলোর উপর এক একটি লেবেল লাগিয়ে দেয়ার মত কাজ করে যার থেকে আমি এটি চিনতে পারি। কখনো এটি ঐ পরিস্থিতির উপর একটি মন্তব্যের চিরকুটের মত কাজ করে। আবার কখনো বা এটি আমার চিন্তাকে থমকে দাঁড়িয়ে নিজের খতিয়ান নিতে বাধ্য করে। এই সব নিয়ে আমার নিজের ভেতরেই চলছে নিরবিচ্ছিন্ন এক নিজস্ব আলাপ– একটি অন্তর্বাচন। এটি আমাদের অনুভূতির ও চেতনারই অংশ– কিন্তু এর একটি ভাষা রয়েছে। প্রশ্ন হলো সেটি কোন ভাষা? এ সম্পর্কে দুটি তত্ত্ব রয়েছে। একটি তত্ত্ব বলে সে এটি

আমাদের সাধারণ ভাষাতেই হয়– যে যেই ভাষাতে অভ্যস্ত, বিশেষ করে আমাদের মাতৃভাষাতে। অর্থাৎ এই তত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের চিন্তার ভাষা আর কথা বলার ভাষার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। অন্য তত্ত্বটি অবশ্য বলে যে চিন্তার ভাষাটি আমাদের অন্তর্নিহিত- চেতনার সঙ্গে এটি আমাদের সার্বিক সত্ত্বায় গ্রথিত আছে– আমাদের কথা বলার ভাষা আর এটি এক নয়। আমাদের অন্তর্বাচন একান্ত নিজস্ব এক রকম চিন্তার ভাষাতেই ঘটে, তারপর অন্যের কাছে প্রকাশের জন্য আমরা সেটি প্রয়োজনমত সাধারণ ভাষাতে অনুবাদ করি মাত্র।

উভয় তত্ত্বের স্বপক্ষেই যুক্তি রয়েছে। চিন্তার ভাষাকে সাধারণ ভাষার থেকে পৃথক মনে করার একটি যুক্তি হলো চিন্তা একটি অবাধ জিনিস, এটি কোন বিশেষ ভাষার গণ্ডির মধ্যে থাকতে পারেনা। একটি ভাষার শব্দ ভাণ্ডার বা ব্যাকরণে আমার চিন্তা সীমাবদ্ধ থাকবে, তা কি হতে পারে? অপর পক্ষে সাধারণ ভাষাকেই চিন্তার ভাষা মনে করার একটি ভাল যুক্তি হচ্ছে চিন্তার ভাষা আভ্যন্তরীণ কোন সহজাত ভাষা হলে নূতন কোন ধারণার আবিষ্কার যখন হয় তাকে প্রকাশের ভঙ্গি বা শব্দাবলী ঐ ভাষায় কী ভাবে আসবে? যেমন পদার্থবিদ্যার কোয়াণ্টাম মেকানিক্সের ধারণা আগে আদৌ ছিলনা। কাজেই এটি নিয়ে যারা চিন্তা করছে তাদের সহজাত চিন্তার ভাষায় তো এ সম্পর্কিত কিছু থাকবেনা, তা হলে এ নিয়ে তাদের অন্তর্বাচন কেমন করে চলবে? একমাত্র সাধারণ ভাষাতেই নূতন ধারণাকে জায়গা দেবার জন্য নূতন শব্দ ও নূতন প্রকাশ ভঙ্গির বা ব্যাকরণ সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে। এই যুক্তি ও পাল্টা যুক্তির বিষয়গুলো নিরসণ করতে হলে চিন্তার ভাষার প্রকৃতি নিরূপণে সরাসরি কোন পরীক্ষণের উপায় থাকতে হবে। সে রকম কোন পরীক্ষণের আয়োজন এখনো করা যায়নি।

আমার চেতনাটিই আমি

চেতনার প্রশ্নগুলো কী

চেতনার প্রশ্নই আমাদের চিন্তার সকল প্রশ্নাবলীর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন। অনেকদিন ধরেই এর বিশ্লেষণ চলছে, অনেক চমৎকার তত্ত্ব একে নিয়ে পাওয়া যাচ্ছে। অনেক কিছু পরিস্কার হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কঠিন কিছু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, যার চূড়ান্ত নিরসণ এখনো বাকি। আর হবেই না বা কেন, আমার চেতনাটিই তো আমি। ঐ চেতনাতেই তার স্বরূপের প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে হয়। এটি দুরূহ কাজ হবে, তাতে অবাক হবার কিছু নাই।

এ সম্পর্কে সাধারণ প্রশ্নগুলোর মধ্যে আসে চেতনা জিনিসটি কী? মস্তিষ্কের কোন্ প্রক্রিয়াগুলো কাউকে সচেতন করে, সচেতন রাখে? চিন্তা প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে বহির্জগৎ সম্পর্কে বা অন্যের মন সম্পর্কে ধ্যান-ধারণায় চেতনার ভূমিকাটি কী ভাবে আসে। এমনি ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রচেষ্টা থেকেই সাফল্যগুলো এসেছে। এর মধ্যে সব চেয়ে মৌলিক বিষয় হলো চেতনার স্বরূপটি বুঝতে পারা। চেতনার স্পষ্ট প্রকাশ হলো আমি যখন সচেতন আমি তখন বুঝতে পারি যে আমি সচেতন। সে সময় আমি নিজের চিন্তা ও কাজকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে আমার স্বাধীন ইচ্ছাকে ব্যবহার করতে পারি। শরীরে স্বাভাবিক প্রকাশে অক্ষমতা থাকলেও আমি তখন কোন না কোন ভাবে নিজের সেই ইচ্ছাকে ব্যক্ত করতে পারি। শুধু ইচ্ছাকেই নয়, সচেতন থাকলে আমি কী দেখছি, শুনছি, অনুভব করছি তাও আমি কোন না কোন ভাবে অন্যকে জানাতে পারি। এগুলোই চেতনার লক্ষণ। কেউ সচেতন আছে কিনা এ সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে চিকিৎসক এসব লক্ষণ দেখেই আমার চেতনা সম্পর্কে আপাতত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

অন্যান্য প্রাণির মধ্যে আমাদের মত চেতনা আছে কিনা এই প্রশ্নটি প্রায়ই আমাদের সামনে এসে পড়ে। পোষা কুকুর, বেড়াল ইত্যাদি একান্ত ঘনিষ্ট সঙ্গীদের ক্ষেত্রে তো বটেই, গরু ছাগল এদের ক্ষেত্রেও আমরা ভাবি এরা কতটা বুঝছে, কতটা সচেতন রয়েছে, কতটা সুখ-দুঃখ, ব্যথা অনুভব করছে ইত্যাদি। চেতনার যত লক্ষণ মানুষের মধ্যে রয়েছে সব কিন্তু অন্যান্য প্রাণির মধ্যে নাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাণি মাত্রেরই যে কোন না কোন পর্যায়ের চেতনা যে রয়েছে এটি স্পষ্ট। বুঝা যাচ্ছে চেতনাও অন্যান্য অনেক কিছুর মতো বিবর্তনের সঙ্গে এসেছে, পরিবর্তিতও হয়েছে। তাই মানুষের চেতনার

কাছাকাছি অনেক বৈশিষ্ট আমরা শিম্পাঞ্জির কাছ থেকে বা গরিলার কাছ থেকে আশা করিনা, একটি পোকার কাছ থেকে তো একেবারেই করিনা। এমন কি যাঁরা ল্যাবোরেটরির পরীক্ষা ইত্যাদি কাজে প্রাণিদের ব্যবহারে তাদের কষ্ট, ব্যথা ইত্যাদি সম্পর্কে খুব ভাবেন এবং এ ভাবে ব্যবহারের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তাঁরাও বিভিন্ন প্রাণির মধ্যে এক্ষেত্রে পার্থক্য করেন। নিু সচেতনার প্রাণির ক্ষেত্রে এ সম্পর্কে আমাদের অপরাধবোধ তুলনামূলক ভাবে কম– কারণ মনে করা হয় ঐ প্রাণিগুলো ব্যথা, কষ্ট, মৃত্যু ইত্যাদি ব্যাপারে সচেতন নয়।

উচ্চতর চেতনা যদি বিবর্তনের ফলেই বিকশিত হয়ে থাকে তবে তার বিবর্তনগত কিছু সুবিধা থাকা স্বাভাবিক- প্রাণির অধিকতর টিকে থাকার ক্ষেত্রে। হয়তো বাইরের পরিবর্তনে তাৎক্ষণিক ভাবে সাড়া দেয়ার ক্ষমতা এই চেতনা সৃষ্টির সুবিধাটি থেকেই এসেছে। তবে সব সময় বাইরের তাৎক্ষণিক ঘটনায় সাড়া দেয়াই চেতনার কাজ নয়। চেতনা বাইরের তাৎক্ষণিকতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের অনুভূতি, নিজের কল্পনা, নিজের সৃজনশীলতায় ডুবও দিতে পারে। সেগুলোও হয়তো চেতনাকে কিছু বিবর্তনগত সুবিধা দিয়েছে, অন্তত মানুষের ক্ষেত্রে যে দিয়েছে তা বেশ স্পষ্ট।

কোন কোন বিজ্ঞানী এ বিষয়ে অবশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত একটি মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে উচ্চতর চেতনা নেহাৎ কাকতালীয় ভাবেই মস্তিষ্কের আকার বৃদ্ধির একটি উপজাত হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদের থেকে স্তন্যপায়ীতে, স্তন্যপায়ী থেকে প্রাইমেটে, অন্য সব প্রাইমেট থেকে মানুষে এভাবে দফায় দফায় মস্তিষ্কের আকার বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তারই ফাঁকতালে কেউ কেউ অন্যদের থেকে উচ্চতর চেতনার অধিকারী হয়েছে, চেতনার নিজস্ব কোন বিবর্তন সুবিধার জন্য এটি ঘটেনি। এটি মানলে বলতে হয় চেতনার ব্যাপারে বিবর্তন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। এই দুই মতের মধ্যে কোন সমঝোতা এখনো হয়নি।

আত্মসচেতনতা

চেতনার তিনটি আলাদা বৈশিষ্ট রয়েছে যার সবগুলো মানুষের ক্ষেত্রে থাকলেও সব প্রাণির তা নাই। এর একটি হলো আত্মসচেতনতা। আর একটি হলো তথ্যের মধ্যে প্রবেশের সুযোগ যার মাধ্যমে তথ্য থেকে আমরা অভিজ্ঞতা নিতে পারি। তৃতীয় বৈশিষ্টটি হলো একেবারেই নিজস্ব ব্যক্তিগত অনুধাবন। এর প্রত্যেকটিই বেশ জটিল। শুরুতে আমরা আত্মসচেতনতার বিষয়টি দেখি।

আমি যে ভাবে অন্য বস্তুকে, অন্য ব্যক্তিকে অনুভব করি, সেরকম নিজেকেও করি- সেটি আমার আত্মসচেতনতা। এটি করার সময় আমরা নিজেকে নিজের কাছ থেকে যেন কিছুটা দূরে সরিয়ে নিই যেন নিজের বাইরে গিয়ে আগন্তকের মতই নিজকে দেখতে পারি ও বিবেচনা করতে পারি, নিজের সম্পর্কে সচেতন হতে পারি। সেই পরিস্থিতিতে আমি নিজের মধ্যে কিছু দেখে নিরাশ হতে পারি, খুশি হতে পারি, আবার কৃতকর্মের জন্য আক্ষেপ করে নিজকে বলতে পারি 'এ তুই কী করলি!' এ কাজটি করার জন্য যেন আমাদের মাথার মধ্যে ছোট একটি 'আমি' বসে আছে, যে সব সময় আমাকে পর্যবেক্ষণ করছে। আমাদের মধ্যে এই আত্ম সচেতনতা থাকলেও অন্য কোন প্রাণির আছে কি? মানব শিশুরও তো খুব ছোট থাকার সময় এই আত্মসচেতনতা দেখা যায় না। কারো ক্ষেত্রে এটি আছে কি নাই তা বুঝার জন্য কিছু কৌশল বের করা হয়েছে। তার মধ্যে একটিকে বলা যায় আয়না পরীক্ষা।

ধরা যাক একটি বানরের আত্মসচেতনতা আছে কিনা পরীক্ষা করতে চাই। তার গালের উপর বড় সড় একটি ফোঁটা এঁকে দিয়ে নিজের গালে তার মুখের সামনে একটি আয়না ধরতে হবে। সে যদি ওটা আয়নায় দেখে হাত দিয়ে নিজের গালে ঐ ফোটাটি স্পর্শ করে এমনকি সেখান থেকে এটি সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করে- তাহলে বুঝতে হবে তার আত্মসচেতনতা আছে। কারণ আয়নায় দেখা প্রতিবিম্বে সে নিজকে চিনতে পারছে, নিজের মুখে ঐ দাগের বিষয়ে সে উদ্বিগ্ন। অধিকাংশ প্রাণির ক্ষেত্রে এমনটি হবেনা, তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়াই হবেনা। দেড় দুই বছর বয়স পর্যন্ত মানব শিশুও ওটি নিয়ে উদাসীন থাকবে, কিন্তু ঐ বয়সের পর আর নয়। এই আয়না পরীক্ষায় পাশ করতে দেখা গেছে শুধু শিম্পাঞ্জি এবং ওরাং ওটাংকে। এমনকি গরিলাও এতে পাশ করেনি, অন্য কোন প্রাণিতো নয়ই।

আর একটি পরীক্ষাকে বলা যায় কৌশলগত ফাঁকির পরীক্ষা। ফাঁকি দিতে হলে অন্যের মনকে বুঝতে হয়, সেই সঙ্গে আত্মসচেতনও হতে হয়। শিম্পাঞ্জিকে দেখা গেছে তার থেকে গায়ে জোর বেশি এমন অন্য শিম্পাঞ্জির ভয়ে খাবার লুকিয়ে রাখতে। যতক্ষণ ঐ বেশি শক্তিমান শিম্পাঞ্জি কাছে থাকে সে ঐ খাবার লুকানোর জায়গার দিকেও তাকায়না, পাছে তার দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। ওটি চলে গেলে, বা দুর্বলতর কেউ কাছে থাকলে তাকানোর ব্যাপারে এই সাবধানতা আর সে নেয়না। এরকম ফাঁকি দেয়ার ক্ষমতাটি আত্মসচেতনতার উপস্থিতি প্রমাণ করে যা খুব বেশি প্রাণির নাই।

আত্মসচেতনতা হচ্ছে নিজকে নিজের কাছ থেকে আলাদা করার ক্ষমতা, অন্যের মন পড়ার ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনও একই ভাবে পড়তে পারা। চেতনার পরবর্তী যে বৈশিষ্ট আমরা দেখবো সেই তথ্যের মধ্যে প্রবেশের সুযোগ তা আত্মসচেতনতার ক্ষেত্রেও প্রয়োগযোগ্য। যদি ঐ তথ্য বাইরের জগতের না হয়ে নিজের তথ্য হয়, তারপরও যদি তাতে আমি প্রবেশ করতে পারি, এর উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করে তাকেও বহির্জগতের মতোই অনুধাবন করতে পারি, তা হলে আমি আত্মসচেতন। মনোযোগের প্রক্রিয়াটি এক্ষেত্রে একই হবে, শুধু লক্ষ্যবস্তুটি ঘুরিয়ে নিজের দিকে তাক করাটাই কথা। এটি মানুষের বাইরে তেমন কেউ বড় একটা পারেনা। একে সাধারণ চেতনার একটি উচ্চতর পর্যায় মনে করা যায়- যেক্ষেত্রে অনুধাবনের জটিলতা অধিক।

তথ্যে প্রবেশের সুযোগঃ মনোযোগ

তথ্য আমরা পাই দুটি উৎস থেকে– আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং আমাদের স্মৃতি। এই উভয় উৎস থেকে পাওয়া তথ্যের মধ্যে সত্যিকার অর্থে ঢুকে সেগুলোকে অভিজ্ঞতার মধ্যে আনতে পারার মাধ্যমেই আমরা বুঝি যে আমরা অচেতন নই। আসলে বহু দিক থেকে তথ্যে ঢুকার এই ক্ষমতাকেই চেতনা মনে করা হয়। চেতনা সম্পর্কে যে তত্ত্বগুলো রয়েছে তাও আসলে এই তথ্যে ঢুকতে পারার প্রক্রিয়া নিয়েই তত্ত্ব। আধুনিকতম তত্ত্ব বলছে তথ্যগুলোতে প্রবেশ করে অনুধাবনের প্রক্রিয়া হলো এরা মস্তিষ্কের নানা অংশে যে নিউরোন ফায়ারিং সৃষ্টি কছে তার সবই পরস্পরের সঙ্গে সমলয় প্রাপ্ত হওয়া। এর ফলে যেন ঐ মুহূর্তে স্নায়ুর অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন উদ্দীপনা পরস্পরের সঙ্গে একই যৌথ উদ্দীপনায় আবদ্ধ হয়ে যায়। যে মুহূর্তে সেটি ঘটে তখনই আমরা সচেতন হই। আসলে এই সমলয় প্রাপ্ত হওয়ার আর এক নাম হলো মনোযোগ। মনোযোগই চেতনা, মনোযোগই তথ্যে প্রবেশ লাভ করা। সাধারণত মস্তিষ্কে অনেকগুলো প্রসেসিং প্রক্রিয়া সমান্তরালভাবে চলে। ফলে তাদের মধ্যে একের উপর অন্যটির চড়াও হবার ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে, যার ফলে অনেক পরস্পরবিরোধী ও বিফল প্রসেসিং দেখা দেয়। তাই সত্যিকার প্রয়োজনের সময় ইন্দ্রিয় অনুভূতি ও স্মৃতি থেকে আসা অনেক তথ্যকে কিছুটা সুপ্ত রাখার প্রয়োজন হয়। এই সুপ্ত রাখার মানে হলো এদেরকে বাদ দিয়ে অন্য কোন বিশেষ কিছুর দিকে মনোযোগী হওয়া। বাইরে থেকে ইন্দ্রিয়লব্ধ কোন অনুধাবন যখন স্মৃতির মধ্যে ইতোমধ্যে থাকা অনুধাবনের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করে তখন স্মৃতির ফিরতি সিগন্যালের মাধ্যমে এটি বিবর্ধিত হয় এবং একই সময় অন্য

সিগন্যালগুলো নিরসণমূলক সিগন্যাল পায় বলে সেগুলো অবদমিত হয়। ঐ মুহুর্তের পরিস্থিতি, প্রয়োজন, নূতনত্ব, ব্যক্তিগত আগ্রহ ইত্যাদির মাধ্যমেও কিছু অনুধাবন এরকম বিবর্ধন সহায়তা লাভ করে। এগুলোই তখন মনোযোগের মধ্যে আসে ও সারা মস্তিষ্কের যৌথ উদ্দীপনার উৎস হয়।

মনোযোগ যে গভীর অর্থে তথ্যে প্রবেশাধিকার দেয় সেটিই হলো সচেতনতার সচরাচর প্রকাশ। এর সঙ্গে আমাদের কর্মরত স্মৃতি অর্থাৎ স্বল্পস্থায়ী স্মৃতির একটি সম্পর্ক রয়েছে। আমরা আগেই দেখেছি ওরকম স্মৃতির আয়ুষ্কালে স্নায়ু সিগন্যাল একটি চক্রাকারে বার বার আবর্তন করতে থাকে। সাধারণত যতক্ষণ এই আবর্তন বজায় থাকে ততক্ষণই মনোযোগও বজায় থাকে, ততক্ষণ আমি সচেতন। মনোযোগ তাই স্বল্পস্থায়ী স্মৃতির আকারে স্বল্পকালীন টুকরা টুকরা হয়ে আসে– যেমন অংক করার সময় ছোট ছোট ধাপে। অবশ্য কখনো কখনো স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি বাহ্যত মনোযোগ বা চেতনা সৃষ্টি না করেই তার কাজ করে যায়। তা হলে মনোযোগ ছাড়াই চিন্তাটি ঘটে যার ফলে একটি বাস্তব কাজও হয়তো হয়ে যায়। যেমন যথারীতি সঠিক চাবি খুঁজে তালায় ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে আসার পরও আমি দ্বিধায় ভুগছি দরজা বন্ধ করেছিলাম কিনা। স্পষ্টত কাজটি অবচেতন মনে করেছি, চেতনার সঙ্গে নয়। তেমনি ধরা যাক অন্য কথা ভাবতে ভাবতে বিজ্ঞাপনে কখন এক ঝলক বরফ জমা কোমল পানীয় দেখেছিলাম বুদবুদ সহকারে বেরিয়ে আসতে। কী দেখেছিলাম বলতে পারবোনা মনোযোগের অভাবে। কিন্তু এতেই গরমের মধ্যে একটি স্নিগ্ধ ভাব এটি আমার মধ্যে এনে দিয়ে গেছে। এও সেই স্বল্পকালীন স্মৃতির কারসাজি যা মনোযোগ সৃষ্টি না করেই চলে গেছে, কিন্তু তার প্রভাব রেখে গেছে। তবে অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে প্রবেশের জন্য মনোযোগের প্রয়োজন হয়।

মানুষের ক্ষেত্রে মনোযোগ সম্ভব, তাই সচেতনতাও সম্ভব। কিন্তু অন্য প্রাণির ক্ষেত্রে এটি কতখানি সম্ভব? স্পষ্টত অনেক প্রাণিতেই তা রয়েছে যদিও সাধারণত তাদের ক্ষেত্রে মনোযোগগুলো সরল প্রকৃতির– খাদ্য, যৌনতা, মাতৃত্ব, আত্মরক্ষা, ক্রোধ, বিরক্তি ইত্যাদি মৌলিক কিছু বিষয়েই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের মনোযোগ বা সচেতনতা ধরা পড়ে। মানুষের ক্ষেত্রে মনোযোগ অনেক কিছুতেই যেতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট বিমূর্ত বিষয়েও। তাছাড়া মানুষ একে আরো সুনিবদ্ধ করার জন্য ধ্যান ইত্যাদি বিশেষ ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারে। ধ্যানে থাকা এবং না থাকা মানুষের মস্তিষ্কে এম আর আই ইমেজিং করে বুঝা গেছে যে ধ্যান মনোযোগ সৃষ্টি করে। এর মানে মানুষ নিজের সচেতনতাকে ইচ্ছে করলে তীব্রতর করে তুলতে পারে।

একেবারেই যা নিজস্ব চেতনা

চেতনা সম্পর্কে সব তত্ত্ব থমকে দাঁড়িয়েছে চেতনার এই অন্য বৈশিষ্টটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। কারণ অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতে চেতনার এই দিকটি এতই ব্যক্তিগত পর্যায়ের যে ব্যক্তির বাইরে গিয়ে এর কোন নৈর্বক্তিক বিশ্লেষণ এখনো সম্ভব হচ্ছে না। গোলাপের গন্ধ সে সব নির্গত উদ্বায়ী গন্ধ-উপাদান-গুলোর সূক্ষ্ম সমন্বয়ে তৈরি তার একটি বৈজ্ঞানিক ফরমুলা দেয়া সম্ভব। নীল রঙ যে কী আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘের হিসাবে তারও একটি বৈজ্ঞানিক বর্ণনা সম্ভব। কিন্তু গোলাপের গন্ধে আমার মধ্যে যে চেতনা ঘটে, বা নীল রঙ আমার মধ্যে নীলের যে বোধ জন্মায় সেটি আর এক জনের বোধের সঙ্গে হুবহু এক কিনা এটি আমি কখনো জানতে পারছিনা। কারণ এই নিজস্ব চেতনাটুকুর কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এখনো নাই। আমার নীল অনুভূতি, আমার গোলাপ গন্ধ অনুভূতি– একান্তই আমার নিজস্ব। এখানে ঠেকে গিয়েছি বলেই চেতনার কোন পূর্ণ তত্ত্ব এখনো নাই– যে অর্থে প্রস্তাবিত তত্ত্ব রয়েছে স্মৃতির, বা শিক্ষনের, বা ভাষার। এই নিজস্ব চেতনার বিষয়টিই তাই চেতনার ‘কঠিন সমস্যা’।

চেতনার পূর্ণ তত্ত্ব– এ কথাটির মানে কী? দৃষ্টির এ রকম পূর্ণ তত্ত্ব আছে বলে আমরা আলোর তরঙ্গ ধর্ম, রেটিনার উপর তার প্রভাব, অপটিক নার্ভে এবং পরে দর্শন কোর্টেক্সে সৃষ্ট স্নায়ু সিগন্যাল ইত্যাদির ভিত্তিতে এর পূর্ণ বর্ণনা দিতে পারি– যা ব্যক্তি নিরেপক্ষ। মনে করি অন্য কোন গ্রহ থেকে বিজ্ঞান আর গণিতে পারদর্শি মানবসম কোন প্রাণি আমাদের সেই তত্ত্বের বর্ণনা বুঝতে পারলো। তা হলে আমাদের মত একই রকম দৃষ্টির ধারণা তারা পেতে পারবে– নিজের অভিজ্ঞতা থেকে নয়, তত্ত্বের বর্ণনা থেকে। তখন যদি তাকে প্রশ্ন করা হয় দৃষ্টি সম্বন্ধে তার ধারণা কী, তা হলে দৃষ্টির অধিকারী না হলেও এর একটি সন্তোষজনক উত্তর সে দিতে পারবে। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় তার কাছে নীল রঙের চেতনাটি কী? তার যদি প্রত্যক্ষভাবে নীল রঙ দেখে সে চেতনা সৃষ্টি না হয় তা হলে এ প্রশ্নের উত্তর সে দিতে পারবেনা। এর কারণ নিজস্ব একান্ত চেতনার সে রকম তত্ত্ব নাই।

অনেকে মনে করেন এক এক ব্যক্তিতে এক এক প্রাণিতে এক এক রকম হওয়াটি চেতনা জিনিসটিরই অন্তর্নিহিত ধর্ম। এ জন্য তাঁরা একটি তত্ত্বও দিয়েছেন- যাতে চেতনাকে দেখা হয় স্নায়ু সাড়ার উল্টো পথযাত্রা হিসাবে। স্নায়ু সাড়া সাধারণত সৃষ্টি হয় ইন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে, তারপর এটি মধ্যবর্তী স্নায়ু অঞ্চল পার হয়ে শেষ অবধি মস্তিষ্কের হেড কোয়ার্টার ফ্রন্টাল কোর্টেক্সে

যায়। সেখানকার বিবেচনা অনুযায়ী এর সাড়ার নির্দেশ যায় মোটর নিউরোনে এবং সেই মত কাজ হয়। বিষয়টির প্রতি আমাদের সচেতনতা জন্মে এই সিগন্যালের উল্টা একটি পথ-পরিক্রমার মাধ্যমে। উচ্চ পর্যায়ের সকল বিবেচনার পর এটি আবার এক রকম অনুভূতির পর্যায়ে যায়– যেটি আমাদের চেতনা। জাগ্রত অবস্থায় এই উল্টা পথ-পরিক্রমার ফলাফলটি আমরা চেতনা হিসাবে বেশ অনুভব করি। এই উল্টা-পথ পরিক্রমার ব্যাপারটি পরিস্থিতি, ব্যাপ্তি, স্থান ইত্যাদি অনুযায়ী ভিন্ন রকমের হতে পারে- তাই চেতনায়ও ভিন্ন স্বাদ দেখা দিতে পারে। আর ব্যক্তি বিশেষে এই স্বাদ এ কারণেই ভিন্ন হতে বাধ্য। আর এ দুটি ভিন্ন প্রাণিতেও এটি কখনো এক রকম হবেনা। ঐ প্রাণির মধ্যে চেতনা আছে আমরা বুঝতে পারছি, কিন্তু তার কাছে এই চেতনার স্বরূপটি কী তা আমরা এখন জানতে পারছিনা, হয়তো কোন দিনই জানতে পারবোনা।

রোবট বা কম্পিউটারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সৃষ্টির কাজ অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে এখন তাদের মধ্যে এক ধরনের চেতনা আরোপের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে এমন রোবট তৈরি সম্ভব হয়েছে যারা পারিপার্শ্বিকতার বিবেচনায় ভবিষ্যতের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারে। নিজেদের হাঁটাচলা কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হলে তারা তাদের এক ধরনের 'আত্ম সচেতনতার' ফলে নিজের 'চিন্তায়' ও চেষ্টায় হাঁটাচলার বিকল্প উপায় উদ্ভাবন করতে পারে। এমন সচেতন রোবটের পক্ষেও অবশ্য ঐ 'একান্ত নিজস্ব চেতনা' লাভের উপায় হয়নি, যেটি মানুষের রয়েছে। তবে বিজ্ঞানীরা বলছেন এও সময়ের ব্যাপার। এদের উপর চেতনা আরোপ ভবিষ্যতে যখন আরো সূক্ষ্ম আরো বেশি মানব-সদৃশ হয়ে উঠবে, তখন তার একান্ত ব্যক্তিগত নিজস্ব চেতনা যে নাই সেটি আমরা বলতেই পারবোনা। এখনো যে আমরা অন্য একজন মানুষের ব্যক্তিগত নিজস্ব চেতনা আছে কি নাই জানি, তা তার কথাবার্তা কাজকর্ম দেখেই তো আন্দাজ করি। সেটিও তো অন্তর্নিহিতভাবে প্রমাণ করার কোন উপায় আমাদের নাই।

ব্যক্তিগত চেতনাকেও বিশ্লেষণে আনা যাবে এমন আশাবাদ অনেক বিজ্ঞানীর রয়েছে। তাঁদের মতে মস্তিষ্কে স্নায়ু প্রক্রিয়া এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ ধারা চালিয়ে যেতে পারলে চেতনার কঠিন সমস্যা চিরকাল কঠিন থাকবেনা। চেতনার কোন অংশ ব্যক্তিগত পর্যায়ের হবার মানে এই নয় যে তা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের বাইরে। ইতোপূর্বে বিজ্ঞান যে সব বিষয়কে পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের আওতায় আনতে পেরেছে সেখানেও ব্যক্তিগত পর্যায়ের বিষয় রয়েছে যা প্রচ্ছন্ন

ছিল বলে ওভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আওতায় আসতে পেরেছে। চেতনার সমস্যাটিও পারবে।

চেতনা নিয়ে কিছু পরীক্ষণ

চেতনার রহস্য উদ্ঘাটনে পরীক্ষণ বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে খাটো করে দেখার উপায় নাই। যেমন চেতনাকে স্নায়ুর সুনির্দিষ্ট প্যাটার্নের আকারে পাওয়া যায় কিনা এই চেষ্টা বহুদিন থেকে চলছে। যেমন বানরের ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে একই উত্তেজক ঘটনায় তার দু'রকমের বিকল্প চেতনা সৃষ্টি হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ সে আগুণ দেখে ভয় পেতে পারে আবার আগুণে কৌতুহলী হতে পারে। ঐ বানরকে এমন ভাবে প্রশিক্ষিত করা সম্ভব যে আমরা তাকে বিশেষ প্রণোদনা দিয়ে ভয়ের চেতনা থেকে কৌতুহলী হবার চেতনার দিকে নিয়ে যেতে পারি, কিংবা কৌতুহলী থেকে ভয়ের চেতনার দিকে। যেমন কৃত্রিম ভাবে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়ে এটি করা যায়। এরকম পরিবর্তন ঘটলে মস্তিষ্কে কোন্ নিউরোনগুলোর সক্রিয়তায় পরিবর্তন হচেছ তার থেকে চেতনার প্যাটার্ন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে।

এ ধরনের পরীক্ষণ থেকে দেখা যাচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিকে যখন আমরা স্মরণে আনি তখন স্নায়ুর সিনাপ্‌স প্যাটার্নে পুনরায় সিগন্যাল সঞ্চারিত হয়ে যে ভাবে ব্যাপারটি ঘটে, সচেতনতা সৃষ্টির ব্যাপারটিও তার খুব কাছাকাছি। এতেও বিশেষ বিশেষ মনোযোগ সৃষ্টি, বিশেষ বিশেষ চেতনা সৃষ্টির জন্য বিশেষ ধরনের প্যাটার্নের কোডিং ঘটে, এবং চেতনার সময়টুকুতে তার ফায়ারিং সক্রিয়তা বজায় থাকে।

একই সঙ্গে কিছু কিছু পরীক্ষণ দেখিয়ে দিচ্ছে যে অতীত স্মৃতি এবং ভবিষ্যৎ কল্পনার থেকে বর্তমানের জন্য একটি স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করাটাই চেতনা। সেদিক থেকে অবশ্য অতীত স্মৃতিকে পুনচালু করার প্রক্রিয়া থেকে চেতনা একেবারেই আলাদা। বরং সচেতন হবার জন্য তাকে অতীত স্মৃতি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হয়। ধরা যাক আমি রাস্তা পার হচ্ছি। আমার সামনে যে লাল বাতি তাকে একেবারেই বর্তমান লাল বাতি হিসাবে চিনতে পারাটাই আমার চেতনা। আমাকে সচেতন হতে হবে যে লাল বাতিটি অতীত স্মৃতি থেকে আসছেনা, এই মুহুর্তে তরতাজা ইন্দ্রিয় অনুভূতি থেকে আসছে। এর অন্যথা হলে বিপদ ঘটতে পারে। অতীত বা ভবিষ্যৎ থেকে বর্তমানকে পৃথক করার এই প্রয়োজনীয়তাটি মানুষ বা অন্য উন্নততর প্রাণির ক্ষেত্রেই শুধু রয়েছে। কারণ সরলতর প্রাণির সে রকম অতীত স্মৃতি নাই, ভবিষ্যতের কল্পনা তো

নাইই। ওরা সব সময় বর্তমান উত্তেজনায় সাড়া দেবার ভিত্তিতেই চলে- বর্তমানকে অতীত বা ভবিষ্যৎ থেকে আলাদা করার গরজ তাদের নাই। এই সমস্যাটি উন্নত প্রাণির, উচ্চতর চেতনার প্রয়োজনও শুধু তাদেরই যারা অনেক স্মৃতি, অনেক কল্পনা নিয়ে চলছে। চেতনাই তাদেরকে বর্তমানের বাস্তবতায় রাখতে সাহায্য করে। একটি সহজ পরীক্ষণেই ব্যাপারটি আমরা প্রমাণ করতে পারি। গতকালে ঘটে যাওয়া একটি সভার দৃশ্য আমরা যদি চোখ বন্ধ করে মনে পুনসৃষ্টি করার চেষ্টা করি সেটি যত জ্বাজ্জল্যমান হবে, এখনই যে সভায় আমি আছি চোখ বন্ধ করে সেটি মনে আনার চেষ্টা করলে তার চেয়ে অনেক বেশি জ্বাজ্জল্যমান মনে হবে। এটি আমাদের বর্তমানের চেতনার কারণে। গতকালেরটি স্মৃতি, আজকেরটি চেতনা।

স্বাধীন ইচ্ছাটি কার? আমার না মস্তিষ্কের

আমরা দেখেছি আমার চেতনা আমারই স্বাধীন ইচ্ছা, নিজের স্বনিয়ন্ত্রিত সত্ত্বা। এখন অতি সাম্প্রতিক (২০০৭ সাল) কিছু গবেষণা এই বিষয়টিতে কিছুটা সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। একটি পরীক্ষণে বেশ কয়েকজন মানুষের সামনে দুটি নিয়ন্ত্রণ বোতাম দিয়ে ইচ্ছেমত তা বাম বা ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে টিপতে বলা হয়েছে। কোন বোতাম কোন হাত দিয়ে টিপবে নিজের মনে সেই সিদ্ধান্ত নেবার সঙ্গে সঙ্গে তা টিপবে। টিপার কাজে ব্যবহৃত হাত, টিপার ঠিক সময় ইত্যাদি রেকর্ড করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এম আর আই ইমেজে ধরা পড়ে কে কোন হাতের আঙ্গুল দিয়ে বিশেষ বোতামকে টিপার সিদ্ধান্ত নিয়েছে- কারণ সিদ্ধান্তের স্নায়ু চিত্রটি ওখানে স্পষ্ট হয়।

এ পরীক্ষণের ফলাফলে এক অদ্ভূত ব্যাপার দেখা গেল। শতকরা ৬০ ভাগ ক্ষেত্রে নিউরোন ফায়ারিং থেকে সিদ্ধান্তটি যে সময় নিতে দেখা গেল তা বোতাম টিপার পাক্কা সাত সেকেণ্ড আগে। যেহেতু ব্যক্তি নিজে সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সচেতন হবার সঙ্গে সঙ্গে বোতাম টিপেছেন, তা হলে ধরে নেয়া যায় তিনি এ সম্পর্কে সচেতন হবার সাত সেকেণ্ড আগেই মস্তিষ্ক তাঁর জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে- যে সম্পর্কে সে সময় তাঁর নিজের কোন চেতনাই ছিলনা। এর মানে দাঁড়ায় সিদ্ধান্তটি তাঁর সচেতন সিদ্ধান্ত নয়, স্বাধীন ইচ্ছার ফল নয়, বরং তার মস্তিষ্কের নিজস্ব ইচ্ছার ফল। আমার মস্তিষ্কই আমাকে না জানিয়েই যেন সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে নিচ্ছে। এই ব্যাপারটি এখন বিজ্ঞানীদের খুব ভাবাচ্ছে, আমাদের স্বাধীন চিন্তা কতখানি স্বাধীন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।

হয়তো এর মধ্যেও একটি সাশ্রয়ী ব্যাপার রয়েছে। সব কিছু যদি আমাকে সচেতনভাবে করতে হতো তা হলে হয়তো মস্তিষ্কের বিবেচনার হেড কোয়ার্টার কোর্টেক্সের আরো অনেক মূল্যবান জমিন মনোযোগের জন্য আলাদা করে রাখতে হতো। সব সময় তার প্রয়োজন নাই বলে আমাদের বিবেচনার জন্য অপেক্ষা না করে এ সব সিদ্ধান্ত মস্তিষ্ক নিজেই নিয়ে নিচ্ছে। আসলে মস্তিষ্কের এই সিদ্ধান্ত নেয়া অবচেতনের অন্তর্গত। সাম্প্রতিক এই পরীক্ষাগুলো অবচেতন ও সচেতনের মধ্যে অবচেতনকে সামনে নিয়ে এসেছে। কোন্‌টি সচেতন ভাবে হবে কি হবেনা সেটির নিয়ন্ত্রণ যেন অবচেতনের হাতেই থেকে যাচ্ছে। স্বাধীন ইচ্ছা ব্যাপারটি সচেতনের মধ্যে নয়, বরং অবচেতন পর্যায়েই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

চেতনার নানা অবস্থা

এখন দেখা যাচ্ছে চেতনা আছে কি নাই এই ব্যাপারটি অত সরল নয়। বিজ্ঞানীরা দেখছেন চেতনা থাকা না থাকার নানা পর্যায় রয়েছে। আগে থেকে যা জানা ছিল তা হলো চেতনা 'জাগ্রত' ও 'ঘুমন্ত' এ দু'রকমের তো আছেই আবার ঘুমন্তের মধ্যে 'স্বপ্ন-বিহীন' ও 'স্বপ্ন সহ' ঘুমের এই দুটি আলাদা অবস্থা রয়েছে। এখন মস্তিষ্ক ইমেজিং এর ফলে চেতনার আরো বিভিন্ন পর্যায় উদ্ঘাটিত হচ্ছে। যেমন ঘুমের মধ্যে হাঁটা বা অন্য রকম সক্রিয়তা যাদের দেখা যায় সে অবস্থায় মস্তিষ্ক ইমেজিং করে দেখা গেছে সেটি একটি ভিন্ন পর্যায়- আধা জাগ্রত, আধা ঘুমন্ত। এ ক্ষেত্রে ইমেজিং এ দেখা যায় কোর্টেক্সে চেতনা অংশের অধিকাংশ স্নায়ু নেভানো থাকলেও আবেগসহ অন্যান্য কিছু অংশ কিন্তু আলোকিত থাকে।

রেম ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখার সময় মস্তিষ্কের ষ্টেম স্নায়ু সিগন্যালকে মোটর অংশে যেতে বাধা দেয়। তাই সে সময় মানুষ নিশ্চল থাকে, সচলতার স্বপ্ন দেখা সত্ত্বেও। কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা কাজ করেনা বলে তারা স্বপ্নে যা দেখে তা নড়াচড়ার মাধ্যমে, কাজের মাধ্যমে করারও চেষ্টা করে। হাঁটা, আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করা ইত্যাদি এর মধ্যে পড়ে। আবার অনেকের এর ঠিক উল্টো ঘটে। জেগে উঠেও তারা ঐ নিশ্চলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনা– নড়তে চড়তে পারেনা অনেক্ষণ।

দীর্ঘদিন 'কোমা'তে থাকা কোন কোন রুগী যাদেরকে আগে সম্পূর্ণ অচেতন মনে করা হতো অতি সম্প্রতি তাদের মাধ্যও সচেতনতা উদ্ঘাটিত হয়েছে।

তাঁরা অন্যদের কথা শুনে বুঝেন কিন্তু সেটি যে পারছেন তা জানাবার কোন উপায় তাঁদের ছিলনা। এখন তাঁদেরকে এমন একটি প্রশ্ন করা হয় যার উত্তর হ্যাঁ অথবা না হবে। যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয় তা হলে টেনিস খেলছেন এমনি একটি অতি সক্রিয় কাজের কথা কল্পনা করতে বলা হয়। আর যদি 'না' হয় তা হলে ধীর গতিতে বাড়ির আশেপাশে পায়চারী করছেন এমন কল্পনা করতে বলা হয়। এ সময় মস্তিষ্কের স্ক্যান করলে এই দুই ক্ষেত্রে দু'রকমের ইমেজ দেখা যায় যাতে বুঝা যায় কোনটি তিনি কল্পনা করছেন, অর্থাৎ উত্তর 'হ্যাঁ' নাকি 'না'। এভাবে চোখের পাতাও নাড়তে না পারা মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ পরীক্ষণে সম্ভব হয়েছে। অন্য সব দিক থেকে অচেতন, অথচ শ্রবণ/দর্শন এবং কল্পনা করতে সচেতন এও সচেতনতার অন্য একটি পর্যায়।

আবেগের রঙে রাঙিয়ে

চিন্তার মধ্যে আবেগের প্রভাব

আবেগের অনুভূতি চিন্তাকে অনেকখানি প্রভাবিত করে। আবেগকে বুঝার চেষ্টাও তাই বিজ্ঞানীদের অনেকদিনের। আবেগের সঙ্গে চেতনার সম্পর্ক খুব কাছের, উভয়টিই আমাদের খুবই একান্ত, খুবই নিজস্ব। স্পষ্টত এটিও বিবর্তনের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি- তাই অনেক প্রাণিদের মধ্যেও আবেগের কমবেশি উপস্থিতি রয়েছে। তবে চেতনার মতই মানুষের মধ্যে আবেগ যে জটিলতা নিয়ে আসে অন্যদের ক্ষেত্রে ততটা নয়। বিবর্তনে বিকশিত হয়েছে বলে আবেগের কিছু বির্বতনগত সুবিধাও নিশ্চয়ই আছে। সাধারণভাবে এটি উপকারী পরিস্থিতিতে প্রাণিকে উল্লসিত করে, এবং অপকারী পরিস্থিতিতে তাকে বিরক্ত করে। এভাবে আবেগ প্রাণিকে উপকারী পরিস্থিতির দিকে যেতে উদ্বুদ্ধ করে অপকারীগুলো থেকে সরিয়ে দিয়ে। টিকে থাকার ক্ষেত্রে এসব অবদান রেখেছে। সামাজিক প্রাণিদের ক্ষেত্রে এটি সামাজিকতার ক্ষেত্রেও অবদান রাখে। এর মাধ্যমে আমরা নিজেদের অনুরাগ বিরাগগুলো স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারি।

কোন কোন প্রাণির কিছু কিছু আবেগ বেশ স্পষ্ট। তবে সেগুলো সরল প্রকৃতির। যেমন কুকুর, বানর, বা শিম্পাঞ্জির ক্ষেত্রে খুশি, দুঃখ, রাগ ইত্যাদি বেশ লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য অনেক প্রাণির ক্ষেত্রে আবেগের রেশ থাকলেও তা তেমন স্পষ্ট নয়। সত্যিকার সকল মাত্রা নিয়ে আবেগ মানুষের মধ্যেই সব চেয়ে বেশি বিকশিত। চেতনার ক্ষেত্রে যেমনটি দেখেছি আবেগেরও একটি নৈর্বক্তিক দিক আছে যা শারীরবৃত্তীয় লক্ষণগুলো থেকে পরিমাপযোগ্য। কিন্তু অপর পক্ষে চেতনার মতই আবেগের একটি দিক প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এতটাই নিজস্ব যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ধরে পড়েনা। সেদিক থেকে আবেগ সম্পর্কেও আমরা এখনো শুধু অংশত কথা বলতে পারছি।

মস্তিষ্কে আবেগের অবস্থান

একটি জিনিস বেশ স্পষ্ট তা হলো মস্তিষ্কে আবেগের স্থান কোর্টেক্সে নয়, কোর্টেক্সের বাইরে এমিগডালা ও হাইপোথ্যালমাসে। গবেষণায় দেখা গেছে যে আবেগের অনুভূতিগুলো এমিগডালা ও হাইপোথ্যালমাসের মধ্যে সিগন্যালের একটি চক্রাকার আবর্তন সৃষ্টি করে। আগেই আমরা দেখেছি যে

হাইপোথ্যালমাস অন্যান্য অংশের সিগন্যালকে কোর্টেক্সে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী ষ্টেশন হিসাবে কাজ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে ঐ চক্রাকার অবস্থান থেকে সিগন্যাল কোর্টেক্সে না গিয়ে সরাসরি পিচুইটারি গ্রন্থিতে চলে যায়, যেই গ্রন্থি যথাযথ হরমোন নিঃসরণের মাধ্যমে সঠিক শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলো সৃষ্টি করে। এত সব হয়ে যায় অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে, মস্তিষ্কের হেডকোয়ার্টার কোর্টেক্সকে কোন রকম খবর না দিয়েই। হরমোনের কারণে শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে থাকতে পারে হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাওয়া, রক্তচাপ বেড়ে যাওয়া, মুখমণ্ডলের বা অন্যত্র পেশিতে টান, কুঞ্চন, মোচড় ইত্যাদি দেখা যাওয়া। এ সবকেই আমরা ভয়, রাগ, খুশি, দুঃখ ইত্যাদি নানা আবেগের শারীরিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে সাধারণত প্রকাশিত হতে দেখি। তাই আবেগের ফলশ্রুতি হলো মস্তিষ্কের উচ্চতর মহলের কোন রকম বিবেচনা হতে পারার আগেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই সব শারীরিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়া। অন্যদিকে বুদ্ধিবৃত্তি হলো প্রধানত ঐ উচ্চ মহল কোর্টেক্সের বিষয়। তাই আবেগের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার সম্পর্ক ক্ষীণ।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত আবেগের সঙ্গে কোর্টেক্সও জড়িত হয়। আবেগের কারণে হরমোন সংঘটিত যে প্রতিক্রিয়া হয় তার থেকে একটি বিপরীতমুখি সিগন্যাল (ফীডব্যাক) এবার কোর্টেক্সকে এ সম্পর্কে জানায়। এটি সাধারণভাবে সব কিছুকে কোর্টেক্সে বিবেচনার জন্য পাঠানোর মত– যেরকম আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ বিভিন্ন অনুভূতি কোর্টেক্সে যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে এটি নিরপেক্ষ ভাবে যাচ্ছে না, আবেগের একরকম ‘চিরকুট’ সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। কোর্টেক্সে বিবেচনার জন্য পাঠানো সিগন্যালগুলো এভাবে খুশির চিরকুট, কিংবা দুঃখের চিরকুট, কিংবা রাগের চিরকুট, ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে যায়। কাজেই বিবেচনাটিও হয় আবেগের রঙে রাঙানো– ঐ চিরকুটের কারণে।

যাকে আমরা চিরকুট বলছি, আবেগের সেই আবেশ আসলে গঠিত হয় খুব সম্ভব নানা রকম নিউরোট্রান্সমিটার দিয়ে। নিউরোন থেকে নিউরোনে সিগন্যাল প্রবাহিত করার ক্ষেত্রে নিউরোট্রান্সমিটার নামের এই রাসায়নিক দ্রব্যগুলোর ভূমিকা আমরা দেখেছি। অবশেষে এভাবে কোর্টেক্সে খবর যাওয়ার পর আবেগের কারণে একটি বিবেচিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়– খুশির কারণে উৎফুল্লতা, অনুরাগের কারণে ঘনিষ্ঠতা, বিরাগের কারণে এড়িয়ে চলা, দুঃখের কারণে কান্না, ভয়ের কারণে পলায়ন অথবা যুদ্ধ, ইত্যাদি। কোর্টেক্সে যাবার আগের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার তুলনায় এগুলোর উপর চিন্তার কিছু প্রভাব থাকে। আবেগ সম্পর্কে যতটা উদ্ঘাটিত হয়েছে তাতে তার একটি ব্যাখ্যা

মস্তিষ্কের ও শারীরিক দিক থেকে দাঁড়ায় বটে, কিন্তু এর ব্যক্তিগত পর্যায়ের অনুভূতিটি, ব্যক্তিগত চেতনার মতই এখনো প্রশ্ন হয়ে রয়েছে।

আবেগের নানা ফলশ্রুতি

উপরে মস্তিষ্কে আবেগ সংক্রান্ত যে সব প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে কারো কারো ক্ষেত্রে এগুলোর বহিপ্রকাশ হতে দেখা যায়না। সেক্ষেত্রে আবেগটি একেবারে ভেতরে থেকে যায়– বুক ফাটে তো মুখ ফাটেনা– এরকম একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়। তারা আবেগে নির্বিকার থাকতে পারে। এর কারণ হিসাব বলা হয় এদের ক্ষেত্রে হাইপোথ্যালমাসের সঙ্গে কোর্টেক্সের সংযোগটি কিছুটা ব্যাহত অবস্থায় থাকে। এর ফলে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াগুলো ঘটলেও আবেগটি অনুভব করতে পারলেও, এর তেমন কোন বাহ্যিক প্রকাশ ঘটেনা। কোন কোন চরম ক্ষেত্রে সংযোগের বৈকল্যগুলো এত বেশি হয় যে, আবেগটি সে অনুভবও করতে পারেনা।

অথচ আবেগের বহিপ্রকাশের একটি বড় গুরুত্ব রয়েছে। সামাজিক ক্ষেত্রে আবেগের যে ভূমিকা তা এই বহিপ্রকাশের মাধ্যমে অন্যের উপর প্রভাব সৃষ্টির ক্ষেত্রে। এমনি একটি প্রভাব হলো অন্যের মধ্যে অনুরূপ আবেগ সৃষ্টি করা। তাই মানুষ অন্যের হাসি দেখে হাসে, অন্যের কান্না দেখে কাঁদে। যে মিরর নিউরোনের সাক্ষাৎ আমরা ইতোমধ্যে পেয়েছি আবেগটি সংক্রমিত হয় তারই মাধ্যমে। মিরর নিউরোন আমাদের দর্শন কোর্টেক্সের মাধ্যমে উজ্জীবিত হয়। চোখে আমরা যা দেখি মিরর নিউরোন তা অনুকরণ করে আমাদের মস্তিষ্কের যথাযথ অঞ্চলকে দিয়ে অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এটি এতই স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয় যে সিনেমার মিলনান্তক দৃশ্যকে নেহাৎ কাল্পনিক গল্প জেনেও আমরা উৎফুল্ল হই, বিয়োগান্ত দৃশ্যতে সত্যি সত্যি কাঁদতে থাকি, বা ভয়ের দৃশ্যে ভীত হয়ে পড়ি। মজার ব্যাপার হলো অপরের আবেগের সহজাত এরকম অনুকরণ যেমন হয় তেমনি নিজের আবেগ আবার নিজের মধ্যে আরো অনুরণন সৃষ্টি করতে পারে। এর ফল হলো নিজের আবেগ স্ব-অনুকরণের মাধ্যমে আরো বড় আবেগে পরিণত হয়। নিজের চিন্তায়, এমনকি দিবাস্বপ্নে এরকম ক্রমবর্দ্ধমান আবেগের সৃষ্টি হয়ে তা আমাদেরকে দৃশ্যমান ভাবে আপ্লুত করতে পারে।

অনেক সময় আবেগের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক একরকম চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ার ফলে আবেগের মূল কারণের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিবিহীন ব্যাপার ঘটে। ধরা যাক সাধারণ একটি লম্বা পোকা দেখে এমিগডালা ও হাইপোথ্যালম্যাসের মধ্যে

আবেগের সাধারণ সিগন্যাল বর্তনীতে আবর্তনের মাধ্যমে পোকার প্রতি এক ধরনের বিরূপ ভাবের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিক্রিয়ায় সামান্য নাক-কুঞ্চন ছাড়া কিছু ঘটেনি। কিন্তু পরে কোর্টেক্সে খবর জানানোর সময় আবেগের 'চিরকুট' লাগানো হলো রীতিমত ভয় পেয়েছি এমন একটু বাড়তি খবর দিয়ে। ফলে কোর্টেক্সের নির্দেশনায় যা আসলো তা ঐ সামান্য পোকার বিরুদ্ধে হবার মত নয়, বরং সাপের মত রীতিমত ভয়ঙ্কর কিছুর বিরুদ্ধে হবার মত। এই প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে এটি আরো গুরুতর ভয়ের আবেগে গড়তে পারে। এমনটি বার বার হয়ে একদম অভ্যাসে পরিণত হতে পারে– পোকা দেখে অস্বাভাবিক রকম ভয় পেয়ে যাওয়ার অভ্যাস। তখন আমরা একে বলি ফোবিয়া- অস্বাভাবিক ভীতি। এক্ষেত্রে এটি পোকা-ভীতি। এমনি অনেক রকম ভীতি আমরা নানা জনের মধ্যে দেখে থাকি– ভীড়ের ভীতি, বদ্ধ জায়গার ভীতি, উচ্চতার ভীতি ইত্যাদি। এর কারণ অনুসন্ধান করে বুঝা যাচ্ছে যে গোলমালটি আবেগের চিরকুট লাগাবার ক্ষেত্রে অর্থাৎ নিউরোট্রান্সমিটারের মিশ্রণের মধ্যে। নিউরোট্রান্সমিটার মিশ্রণে ভারসাম্যের অভাব হলে এমনটি ঘটতে পারে। ভীতি ছাড়াও আরো অনেক রকম চরম আবেগের সৃষ্টি এটি করতে পারে, যেমন চরম বিষণ্নতার সৃষ্টি।

এরকম চরম বিষণ্নতা অনেকের জীবনের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে, এমনকি আত্মহত্যা প্রবণতার কারণ হতে পারে। তাছাড়া এমনিতেও এ ধরনের বিষণ্নতা সব কিছুকে নেতিবাচক হিসেবে দেখার একটি কারণ ঘটায়। ধরা যাক মেলায় অনেক মানুষ স্ফুর্তি করছে। কিন্তু চরম বিষণ্ন কারো কাছে নেতিবাচক আবেগের চক্রবৃদ্ধির কারণে এমন দৃশ্যও অসহ্য হয়ে উঠতে পারে। তখন ওখানকার মানুষের ভীড়কে মনে হাত পারে পোকার কিলবিল করা।

দীর্ঘস্থায়ী আবেগঃ মুড

আবেগের দীর্ঘস্থায়ী রূপকে আমরা মুড হিসবে চিনতে পারি। আবেগের 'চিরকুটকে' আমরা যে ভাবে নিউরোট্রান্সমিটার দিয়ে গঠিত হিসাবে দেখেছি, মুডও তেমনি প্রধানত নিউরোট্রান্সমিটারেরই কারসাজি। সাধারণত মুডের ক্ষেত্রে নেতিবাচকগুলোই বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে– যেমন বিষণ্নতা, উদ্বেগ, ভয় ইত্যাদি। দেখা যায় এক এক জন মানুষ সব সময় বিষণ্নতার আবেগের মধ্যে ডুবে থাকলে তার শরীর স্বাস্থ্য, তার জগত সবই এই মুডের দ্বারা আচ্ছন্ন ও প্রভাবিত হয়ে পড়ে। সম্মুখ কোর্টেক্সে সেরটোনিন, ডোপামাইন এরকম কয়েকটি নিউরোট্রান্সমিটারের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে এ ধরনের মুডের সম্পর্ক রয়েছে।

এসব মুড বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শরীরের উপর এদের প্রভাবের কারণে। আবেগ যখন মুডে পরিণত হয় তখন নিউরেট্রোন্সমিটারের কারসাজিতে আমাদের কর্মরত স্মৃতিতে তার প্রভাব পড়ে। আগেই দেখেছি এই কর্মরত স্মৃতি বা স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি আমাদের চেতনারই অংশ। এভাবে স্থায়ী আবেগ যখন আমাদের চেতনার দখল

প্রধান কয়েকটি নিউরোট্রান্সমিটারের প্রভাব

নিয়ে নেয় তা নানা শারীরবৃত্তিক কাজের ব্যাঘাত ঘটাবে তা তো স্বাভাবিক। এ জন্য বহু রকম অসুখেই এই মুডকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ নিয়ন্ত্রণ এখন ওষুধ দিয়েও সম্ভব– যেমন নিউরোট্রান্সমিটার নিয়ন্ত্রণ করে বিষণ্ণতা মুক্ত করার মত এন্টিডিপ্রেসেন্ট ওষুধ। সরাসরি শারীরিক চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে এই ওষুধ প্রয়োগও এখন প্রায়শ করা হচ্ছে। অবশ্য মুড শুধু বিষণ্ণতা নিয়ে নয়, নানা নিউরোট্রান্সমিটারের হ্রাসবৃদ্ধির নানা মিশ্রণে আরো নানা মুড সৃষ্টি হয়– অকারণ চিরউৎফুল্লতা, উদ্বেগ বা ভীতি, এগুলোও কম অনর্থের সৃষ্টি করেনা।

মাদকের প্রভাবে মুড

নানা কারণে মানুষের বিভিন্ন মুড যে সৃষ্টি হতে পারে এবং এর নানা প্রতিক্রিয়া যে হতে পারে সেটি দেখলাম। কিন্তু কৃত্রিম ভাবে সেই লক্ষ্য নিয়েই ওরকম চরম মুড সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে মাদক দ্রব্যাদি। মদ্যপান ইত্যাদির মাধ্যমে এরকম করার ইতিহাস দীর্ঘ-কালীন। তাছাড়া গাঁজা, আফিম ইত্যাদির ব্যবহারও এরকম চরম মুডের মধ্যে নিজেদেরকে বিভোর রাখার কাজে ব্যবহার করে এসেছে এর সেবনকারীরা। আর আজকের আরো পরিশ্রুত এবং অতি বেশি কার্যকর অন্যান্য মাদকগুলোতো পুরো বিষয়টিকে অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এদের কোনকোনটি কাজ করে মস্তিষ্কের বিভিন্ন ক্রিয়াকে

মন্থর করে তুলে, এবং এক ধরণের কৃত্রিম আরাম, সব চিন্তা-দুশ্চিন্তা ভুলিয়ে দেয়া অলীক প্রশান্তি সৃষ্টি করে। আবার অন্যগুলো কাজ করে এক ধরনের অতি-উৎফুল্ল, অতি-সক্রিয় সুখানুভূতি সৃষ্টি করে। বিশেষ করে সাইকেডেলিক বলে পরিচিত মাদকগুলো স্বপ্নরাজ্যে ভেসে বেড়াবার মতো কৃত্রিম অনুভূতির সৃষ্টি করতে পারে। মাদকসেবীরা বাস্তব জীবনের সকল চিন্তা ভাবনা দায়দায়িত্ব ভুলে এভাবে স্বপ্নরাজ্যে ভেসে বেড়াবার পথ হিসেবেই এগুলোকে বেছে নিয়ে থাকে।

মাদকগুলো সাধারণত সরাসরি মস্তিষ্কের সম্মুখ কোর্টেক্সের উপর কাজ করে এর বিবেচনা ও বিচারবুদ্ধি সংক্রান্ত কাজে ব্যাঘাত ঘটায়। এই ব্যাঘাতের ফলে আবেগের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলো কাজ করতে পারেনা– এর কোন কোন প্রক্রিয়াকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে, আবার কোন কোন প্রক্রিয়াকে অতি উত্তেজিত করে তোলে। এতে সব চেয়ে বড় ক্ষতি হয় মাদকের উপর আসক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে। মাদকসেবীর মস্তিষ্ক সাধারণত সুখানুভূতি সৃষ্টিকারী ডোপামাইনকে এক ধরনের পুরস্কার হিসাবে বিবেচনা করে। এই ডোপামাইন আবার ওরকম অনুভূতি সৃষ্টি হবার 'চিরকুট' হিসবে কাজ করে। এভাবে সৃষ্টি হওয়া অতীতের সুখানুভূতিগুলো মস্তিষ্কে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে সুখস্মৃতি হিসাবে জমা হয়। এটি যে কোন দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির মত বলিষ্ঠকৃত স্থায়ী সিনাপ্‌স প্যাটার্ন গঠন করে। এটিই সব সময় আরো ডোপামাইন-পুরস্কার পাওয়ার জন্য আরো চাহিদা সৃষ্টি করে। চাহিদার উদ্দেশ্য হলো যেন ডোপামাইন জনিত সিগন্যাল আবার ইতোমধ্যে সৃষ্টি হওয়া ঐ প্যাটার্নকে অনুসরণ করতে পারে। ঐ চাহিদা অনুযায়ী আরো মাদক নিলে ঐ সুখ-স্মৃতি ও সিনাপ্‌স-প্যাটার্ন আরো বলিষ্ঠ হয়ে উঠে এবং চাহিদা আরো বৃদ্ধি পায়। এ ভাবেই সৃষ্টি হয় মাদকের প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান আসক্তির। এই প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কে স্থায়ী ক্ষতি ঘটতে থাকে, যা পরে মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে।

আসক্তির বিপদ হলো প্রক্রিয়াটি বেশি এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একে থামানো অতি কঠিন কাজ হয়ে পড়ে । যদি চেষ্টা করে মাদক থেকে বিরত থাকা যায় এবং স্থায়ীভাবে থাকা যায় তবে আসক্তি দূর করা সম্ভব। কিন্তু সেটি ক্রমে কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ মাদক থেকে বিরত রাখার ফলেও নানা রকম শারীরিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যা সহ্য করেই এটি করতে হয়। এতে যদি সাফল্য আসেও তাতেও নিশ্চিন্ত থাকার উপায় নাই। আপাতত আসক্তি দূর হয়ে গেছে মনে হলেও সেই পুরানো দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির মতো এই স্মৃতিও যে কোন সময় সামান্য ইশারা পেলে জেগে উঠতে পারে, এবং

মাদকের চাহিদা আবার মাথা চাড়া দিতে পারে। সহজে হাতের নাগালে মাদক পাওয়া, পুরানো মাদকসেবী বন্ধুদের উৎসাহ পাওয়া, বর্তমান জীবনে হতাশায় ভোগা ইত্যাদি থেকেই এমন ইশারা আসতে পারে। তাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে সাবধানতার সঙ্গে না চললে ঐ দুষ্ট চক্রের থেকে নিরাপদে থাকা দুরূহ। সবচেয়ে ভাল কাজ হলো মাদকের ছোঁয়ার মধ্যে একেবারেই যেন কেউ না যায় সেই ব্যবস্থা করা।

চিন্তা-চেতনার গবেষণা

বিজ্ঞানের যে ক'টি সীমান্ত একুবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীদেরকে সব চেয়ে বেশি সচল রাখছে নিসন্দেহে চিন্তা-চেতনার স্বরূপ উদ্ঘাটন তার মধ্যে একটি। এর বড় চ্যালেঞ্জ হলো মস্তিষ্কের শারীরবৃত্তের মধ্যে একে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা। সে চেষ্টা এখন অনেকটা ফলপ্রসু। একদিকে চিন্তার 'কঠিন প্রশ্নগুলোকে' আরো সুপ্রমাণিত ভাবে তত্ত্বে উপস্থাপন করা, অন্য দিকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে মানব মস্তিষ্কের সঙ্গে প্রায় সমপর্যায় ভুক্ত করে ফেলার দ্বিবিধ লক্ষ্য নিয়ে এ সম্পর্কিত বিজ্ঞান দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১: আমরা দেখলাম বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রাইমেটের ও মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটেছে, মস্তিষ্ক আকারে বড় হয়েছে। এটি কি আরো বিকশিত হচ্ছে? আমাদের মস্তিষ্ক কি আরো বড় হবে?

উত্তর ১: কোন দিক থেকে বিবর্তন যে সব সময় সমগতিতে চলে তা নয়। এক একটি প্রজাতি দীর্ঘকাল একটি স্থিতির মধ্য দিয়েও যায়। প্রজাতি হিসাবে আমরা হোমোসেপিয়েন্সের বয়স মাত্র দেড় লক্ষ বছর বা তার কাছাকাছি। বিবর্তনের ইতিহাসে এটি নগণ্য সময়। এটি একটি স্থিতির মধ্য দিয়েই কাটছে। তাছাড়া আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মস্তিষ্ক তথ্য আমাদের দেহের উপর বিবর্তনের চাপ কমিয়ে ফেলেছে। পরিবেশ পরিবর্তনের খাপ খাইয়ে নেয়ার দায়িত্ব আমাদের ক্ষেত্রে যেন বিবর্তনের বদলে অনেকখানি আমাদের প্রযুক্তিই তুলে নিয়েছে। তবে জীব হিসাবে আমরা বিবর্তনের একেবারে বাইরে নই। সুদূর ভবিষ্যতে কোন কোন দিকে সেটি স্পষ্ট হবে না, এমন কথা নাই।

প্রশ্ন ২: মানুষ চিন্তা করে কেন?

উত্তর ২: চিন্তার ক্ষমতা ও চিন্তার অভ্যাস আমরা বিবর্তনের মাধ্যমেই পেয়েছি। শুধু মানুষ কেন, চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা অন্যান্য বহু প্রাণিরই তো রয়েছে। একটি ইদুঁরকেও তার মত করে চিন্তা করতে হয়- খাদ্য সংগ্রহের জন্য, আত্মরক্ষার জন্য, ইত্যাদি নানা কারণে। মস্তিষ্কের বিকাশের মাধ্যমে এই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে অভূতপূর্বভাবে উন্নত হয়েছে বটে, কিন্তু অনেক সরলতর প্রাণির সরলতর মস্তিষ্কেরও বেঁচে থাকার জরুরী কিছু চিন্তার ক্ষমতা রয়েছে। আমাদের মস্তিষ্কের বৃহত্তর ও জটিলতর প্রকৃতি অবশ্য একে কল্পনা, সৃজনশীলতা সহ অনেক উচ্চতর চিন্তার সুযোগ করে দিয়েছে, যার ফলে আমরা আজ চিন্তার প্রকৃতি নিয়েও চিন্তা করতে পারছি। মস্তিষ্কের অধিকতর ক্ষমতাই আমাদেরকে এরকম উচ্চতর চিন্তার পথে নিয়ে গেছে।

প্রশ্ন ৩: মস্তিষ্কের নমনীয়তা এক অংশকে অন্য অংশের কাজ নিজে নিয়ে নিতে সহায়তা করে। এটি কি বুদ্ধির প্রতিবন্ধিতা দূর করতে কাজে আসতে পারে?

উত্তর ৩: সাধারণত অতীতে মস্তিষ্কের কাজ স্বাভাবিক থাকলে এবং পরে দুর্ঘটনা বা রোগের কারণে তার কোন নষ্ট হলে সেক্ষেত্রে নমনীয়তা

কাজে আসে। মস্তিষ্কের নষ্ট অংশ আবার স্বাভাবিক হতে পারে, অথবা অন্য অংশ এর কাজ নিতে পারে। জন্মগত বা বংশগত ভাবে প্রতিবন্ধিতা থাকলে সেক্ষেত্রে এই নমনীয়তা বেশি কাজে আসেনা। নমনীয়তার সুন্দর উদাহরণ দেখা যায় স্ট্রোকের ফলে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত রুগীরা যখন ব্যায়ামের মাধ্যমে আবার মস্তিষ্কের ঐ নষ্ট অঞ্চলগুলোকে আবার সক্রিয় করতে পারে। এভাবে অঙ্গচালনা, বাচনক্ষমতা ইত্যাদি ক্ষমতা রোগি ফেরৎ পেতে পারে মস্তিষ্কের সংশ্লিষ্ট অংশের পুণসক্রিয়তার ফলে।

প্রশ্ন ৪: মানুষের চিন্তার ক্ষমতা কি তার নিউরোনের সংখ্যার দ্বারা সীমাবদ্ধ?

উত্তর ৪: মানুষের বড় মস্তিষ্ক তার চিন্তাকে অভূতপূর্ব পর্যায়ে নিতে সক্ষম করেছে। এদিক থেকে নিউরোন সংখ্যার একটি বড় গুরুত্ব রয়েছে। তবে চিন্তার সব কাজের জন্য মানুষের যত সংখ্যক নিউরোনের প্রয়োজন রয়েছে তার চেয়ে অধিক মস্তিষ্কে রয়েছে। তাই নিউরোনের সংখ্যার অভাবে স্মৃতি বা চিন্তার অন্য কোন উপাদানের বিঘ্ন মস্তিষ্কে হয় তা বলা যাবে না। সে রকম পরিস্থিতি যে অবস্থায় হতে পারতো আমাদের মস্তিষ্ক তা এড়িয়ে গেছে। যেমন শুধু সার্বজনীন ব্যাকরণটুকু না হয়ে, পুরো ভাষা বা শব্দ অভিধান যদি মাথায় গ্রথিত থাকতে হতো অথবা সব স্বল্পস্থায়ী স্মৃতিকে যদি দীর্ঘ স্থায়ী স্মৃতি হতে হতো, তা হলে হয়তো নিউরোনের অভাব দেখা দিত। প্রকৃত পক্ষে নিউরোনের সংখ্যার সীমাবদ্ধতা আমাদের চিন্তায় তেমন কোন সীমাবদ্ধতা আনছেনা।

প্রশ্ন ৫: আমরা জানি যে সব স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি কোন না কোন ভাবে বিশিষ্টতা লাভ করে শুধু সেগুলোই দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে পরিণত হয়। কিন্তু দেখা যায় অনেক গুরুত্বহীন ঘটনা যা মনে রাখতে চাইনি, তা দীর্ঘদিন ধরে মনে থাকে। এটি কেন হয়?

উত্তর ৫: আসলে বিশিষ্টতা পাওয়ার বহু পথ রয়েছে। এখনকার বিবেচনায় ঘটনাটি গুরুত্বহীন মনে হলেও যে সময় ঘটেছিল তখন কোন না কোন ভাবে এটি মনে রেখাপাত করেছিল, অবচেতন মনে হলেও। সব সময় যে মনে রাখতে চাইতে হবে এমন কথাও নাই। স্বয়ংক্রিয়ভাবেও ঐ বিশিষ্টতার জন্য দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির স্নায়ু ফায়ারিং ঘটতে পারে।

প্রশ্ন ৬: আমরা যখন এক সঙ্গে দুটি কাজ করছি যেমন পড়াশুনা করছি, একই সঙ্গে গানও শুনছি, তখন মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে? কিছুক্ষণ পর দেখা যায় এই দুইয়ের মধ্যে একটিকেই আমরা ভাল মনে করতে পারছি, অন্যদিকে নয়। এটি কেন?

উত্তর ৬: মস্তিষ্ক দুটি চিন্তা একই সঙ্গে সমান্তরাল প্রসেসিং করতে পারে। তাই পড়াশুনা করার সঙ্গে সঙ্গে গান শুনার সুখানুভূতি আমাদের হতে পারে। কিন্তু এখানে মনোযোগের একটি ব্যাপার রয়েছে। অন্যগুলোকে অবদমিত করে যে চিন্তাটিকে আমি উচ্চকিত করছি সেটিই শুধু মনোযোগ পাচ্ছে। মনোযোগের সঙ্গে চেতনার আর কর্মরত স্মৃতির সরাসরি সম্পর্ক থাকে। তাই একটু পরে মনে করতে চাইলে যেটি মনোযোগ পেয়েছিল সেটিই মনে থাকবে বেশি।

প্রশ্ন ৭: দু'জন মানুষ একই জিনিস বা একই ঘটনা দেখে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম চিন্তা করতে পারে কেন?

উত্তর ৭: এটি খুবই স্বাভাবিক। কারণ যা আমরা দেখলাম, শুনলাম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করলাম তা চিন্তার একটি প্রধান উপাদান হলেও একমাত্র উপাদান নয়। মানুষের মস্তিষ্ক এই অনুভূতিকে নিজের মতো করে গ্রহণ করে। মস্তিষ্কে থাকা যার যার স্মৃতি, বিশেষ আবেগের প্রবণতা, ইত্যাদির সঙ্গে মিশে একই ঘটনা এক এক জনের মধ্যে এক এক রকম চিন্তার সৃষ্টি করতে পারে।

প্রশ্ন ৮: আমাদের শরীরে কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দুর্ঘটনায় বা অস্ত্রোপাচারে হারালে আমরা তা সত্ত্বেও এর উপস্থিতি অনুভব করি। দেখা যায় যে টিকটিকির লেজ খসে গেলেও সেই লেজ বেশ কিছুক্ষণ নড়াচড়া করতে থাকে। এটিও কি একই ব্যাপার?

উত্তর ৮: মোটেই না। অলীক অঙ্গ অনুভব করাটি মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর ব্যাপার। টিকটিকির খসে পড়া লেজ স্নায়ুর কারণে নড়া চড়া করেনা। বরং এর পেশির মধ্যে স্প্রিং এর মত দম দেয়া কিছু শক্তি জমা থাকে যা খসে পড়ার পরও নড়াচড়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এতে অবশ্য টিকটিকির আত্মরক্ষার সুবিধা হয়। ইচ্ছা করে লেজ খসিয়ে দিয়ে সে শত্রুকে বিভ্রান্ত করতে পারে– বিশেষ করে সেই লেজ নিজেও যখন নড়াচড়া করতে থাকে।

প্রশ্ন ৯: প্রায়ই শুনি যে একজন আরেকজনকে হিপনোটাইজ করতে পারে অর্থাৎ তাকে সম্মোহিত করে কিছু করাতে পারে। এটি কীভাবে সম্ভব?

উত্তর ৯: এটিও মস্তিষ্কের উচ্চ বিবেচনার অভাব ঘটিয়েই সম্ভব। অনেকটা গায়েবী আওয়াজ শুনা বা অলীক দৃশ্য দেখার মত করে। যে সম্মোহিত হবে তার মধ্যে এর জন্য যথেষ্ট ইচ্ছা তৈরি হতে হয়। অন্য সব মনোযোগ বন্ধ করে সে এটিই হতে চাইবে। তখন তাকে একটানা একই কথা বলে মনোযোগকে আরো আবিষ্ট করে কিছু করতে বলা হলে মস্তিষ্কের মোটর মেকানিজম সহজেই সেই অনুযায়ী কাজের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তার উচ্চতর চেতনার ও বিচার বিবেচনার পথগুলো ওরকম ইচ্ছা ও পরিবেশের দ্বারা বন্ধ হয়ে যায় বলে সে সম্মোহিত হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ১০: দেখা যায় যে আমরা প্রায়ই কোন একটি বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকি এবং কিছুতেই ঐ উদ্বেগের বিষয়টিকে ভুলতে পারিনা, শত চেষ্টা করেও। এটি কেন?

উত্তর ১০: স্মৃতি জাগ্রত হয় কোন একটি ট্রিগার বা ইশারা পেলে। উদ্বেগের কারণ যে স্মৃতি তার ট্রিগার একবার হয়ে গেলে বিষয়টি যদি বেশি রেখাপাত করার মত হয় তা হলে তার বিষয়টি বার বার চিন্তায় আসি। ইচ্ছে করলেই কোন স্মৃতিকে দমিয়ে রাখার কোন সহজ উপায় নাই, তাকে চিরতরে মুছে দেবার মত কোন ব্যবস্থাও নাই কম্পিউটারের ইরেজ বাটনের মত। তবে অন্য স্মৃতি বা অন্য কাজের দিকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে এর চেষ্টা করা যায়।

প্রশ্ন ১১: 'জ্বিনে ধরেছে' বলে যে কথাটি বলা হয় আসলে ওটি কী? দেখা যায় যাকে জ্বিনে ধরেছে বলা হচ্ছে সে বেশ অস্বাভাবিক আচরণ করছে।

উত্তর ১১: এটিও গায়েবী আওয়াজ শুনা, বা অলীক দৃশ্য দেখার মতই একটি ব্যাপার। এই ক্ষেত্রে অলীক স্পর্শ বলা যেতে পারে শুনা বা দেখার মত স্পর্শও একটি অনুভূতি যা অলীক ভাবেও অনুভব করা যায়। নিজের মনকে যদি এরকম জ্বিনে ধরার বিশ্বাসে একাগ্র করে তোলা হয় এখন উচ্চতর বিবেচনা অগ্রাহ্য করে এমন জ্বিনের উপস্থিতি বোধ হতে পারে এবং সেই অনুযায়ী আচরণও ঘটতে পারে বিরল ক্ষেত্রে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবেগাহত অসহায় কিশোরী বা অন্যান্যদের

স্বাভাবিক তীব্র আবেগের প্রকাশকে সামাজিক ভাবে মেনে না নেবার কারণে কুসংস্কারচ্ছন্ন সমাজে একে জ্বিনে ধরা বলে চালিয়ে দেয়া হয়।

প্রশ্ন ১২: আমরা দেখি কারো পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটি অচল হলে অন্যগুলো আরো দক্ষ হয়ে এর ক্ষতি কিছুটা পূরণ করতে পারে। যেমন অন্ধ হলে শ্রবণ আর স্পর্শের ক্ষমতা বাড়ে। এটি কেন?

উত্তর ১২: ইন্দ্রিয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলোর অনুধাবনে শুধু ইন্দ্রিয়টির নয়, বরং মস্তিষ্কের একটি বড় ভূমিকা থাকে। একটি ইন্দ্রিয় কাজ না করার ফলে মস্তিষ্কের আনুসঙ্গিক অংশের কাজ থাকেনা। মস্তিষ্কের নানা অংশের কাজের বিশিষ্টতা থাকলেও সার্বিক ভাবে সব অংশের এমন নমনীয়তা রয়েছে যে এটি প্রয়োজনে অন্য দায়িত্বও নিতে পারে। এরকম প্রয়োজনে মস্তিষ্কের কাজ হারানো অংশের স্নায়ু বর্তনিগুলো নূতন ভাবে পুনর্বিন্যস্ত হতে পারে অন্য ইন্দ্রিয়ের অনুধাবন করার জন্য। তখন নষ্ট ইন্দ্রিয়টির অনুধাবন না করতে পারার ক্ষতি এগুলোর আরো তীক্ষ্ণ অনুধাবনে কিছুটা পূরণ হয়।

প্রশ্ন ১৩: দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি যত ঘন ঘন মনে করা যাবে, ব্যবহার করা যাবে, ঐ স্মৃতি হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা তত কমে কেন?

উত্তর ১৩: স্মৃতি যত বেশি মনে করা হবে ততই তাকে আবার সহজে মনে হবার সম্ভাবনা বাড়ে। একেবারে হারিয়ে যাওয়াটি সাধারণত অসুখ-বিসুখেই হয়ে থাকে– বিশেষ করে বৃদ্ধ বয়সে স্মৃতিভ্রষ্টতার অসুখে। অন্য ক্ষেত্রে সমস্যাটি হলো মনে পড়ার। তবে স্মৃতিকে যখনই মনে করে পুনরুদ্ধার করা হয় তখনই একে ধারণ করে রাখা সিনাপ্‌স প্যাটার্নের মধ্য দিয়ে স্নায়ু-সিগন্যাল প্রবাহিত হয়ে এটি আরো একটু বলিষ্ঠ হয়। এমন বলিষ্ঠতা ভবিষ্যতে মৃদু ইশারাতেও আবার মনে পড়ার সম্ভাবনা বাড়ায়।

প্রশ্ন ১৪: স্বপ্ন মস্তিষ্কের স্মৃতি থেকে আসলেও উচ্চতর কোর্টেক্সের নিয়ন্ত্রণ থাকেনা বলে তা সাধারণত যৌক্তিক হতে পারে না। কিন্তু আমরা যখন সত্যি ঘটনাগুলো স্বপ্নে দেখি সব কিছু যৌক্তিকভাবে, তখন কি কোর্টেক্সের নিয়ন্ত্রণ থাকে ঘুমের মধ্যেও?

উত্তর ১৪: স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই, এটি যৌক্তিক হবার কোন কারণ নাই। এর প্রক্রিয়াটিই এমন যে এটি অগোছালো হবে। স্মৃতিগুলো হয়তো হুবহু আসছে কিন্তু তার মধ্যেই অনেক কিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

সাম্প্রতিক কোন দাগকাটা ঘটনা ও অতীত স্মৃতি মিলে তৈরি হয় বলে বাস্তবতার সঙ্গে স্বপ্নের কিছু কিছু ধারাবাহিকতা থাকে। সে জন্য একে অনেক সময় বেশ বাস্তবসম্মতও মনে হতে পারে বা ইচ্ছা পূরণের দিক থেকে যৌক্তিক মনে হতে পারে। কিন্তু সার্বিক অর্থে স্বপ্ন অযৌক্তিক ও এলেমোলো জিনিস।

প্রশ্ন ১৫: গুরুত্ব ও বিশিষ্টতার অভাবে অনেক স্বল্পস্থায়ী স্মৃতি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনা তা বুঝলাম। কিন্তু যেই জিনিস অতি গুরুত্ব দিয়ে মনে রাখার চেষ্টা করছি লেখাপড়ার সেই জিনিসগুলো মনে রাখতে পারছিনা কেন?

উত্তর ১৫: আমি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি ঠিকই, কিন্তু মনে রাখতে হলে তথ্যটি আমার কাছে অর্থপূর্ণও হতে হবে, আমি এটি ভাল করে অনুধাবন করতে হবে। এটি অনুধাবন না করেই অনেক সময় পরীক্ষার খাতিরে মুখস্থ করার চেষ্টা করছি বলেই অনেক পাঠ্যবস্তু মনে রাখা কঠিন হয়। সে ক্ষেত্রে নানা রকম কলাকৌশল করে ছড়া বানিয়ে, পরিচিত কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে মনে রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু সেগুলো নেহাতই কৃত্রিম উপায়। অনুধাবনই মনে রাখার সর্বোত্তম উপায়।

প্রশ্ন ১৬: কোন কোন মানুষ ঘুমের মধ্যে হাঁটে– স্লিপ ওয়াকিং এ। এরপর ফিরে এসে আবার ঘুমায়– জেগে উঠার পর এসব কিছুই মনে রাখতে পারেনা। এখানে মস্তিষ্কের কাজ কী?

উত্তর ১৬: এটি স্বপ্নের আর একটি মাত্রা। স্বপ্ন আমরা শুধু দেখেই ক্ষান্ত হই। এখানে আমাদের মস্তিষ্কের মোটর অংশটিও সচল হয় যার ফলে আমরা হাঁটতে পারি।

প্রশ্ন ১৭: স্বপ্নে দেখা কোন কোন ঘটনা তো পরে সত্যি সত্যি ঘটে। এটি কীভাবে সম্ভব হয়?

উত্তর ১৭: এতে অবাক হবার কিছু নাই। স্বপ্নতো স্মৃতি থেকে আসছে, আর আসছে ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা থেকে। অতীতে যা একবার ঘটেছে সে রকম জিনিস আবার তো ঘটতেই পারে। আর ভবিষ্যতের জন্য যা চিন্তা করছি তার কোন কোনটি তো ঘটতেও পারে। এটি পুরাপুরি ইতস্তত সম্ভাবনার ব্যাপার। স্বপ্নের যত খানি পরে ঘটে তার চেয়ে অনেক বেশি ঘটে না। সেগুলোর কথা আমরা বলিনা। পুরো ব্যাপারটিতে কোন নিশ্চয়তা নাই।

প্রশ্ন ১৮: আত্মভোলা যে সব মানুষ তাদের কি স্মৃতির সমস্যা আছে?

উত্তর ১৮: না, তবে মনোযোগের সমস্যা আছে। আবার চেতনার সঙ্গেও মনোযোগের সম্পর্ক রয়েছে। মস্তিষ্কের সমান্তরাল ভাবে চলমান স্নায়ু ফায়ারিং প্যাটার্নগুলোর একটিকে উচ্চকিত ও অন্যগুলোকে অবদমিত করে এই মনোযোগ আসে। যারা প্রায়শ কোন না কোন জিনিসের দিকে মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয় তারাই আত্মভোলা হয়ে থাকে। এটি স্মৃতি, বুদ্ধিচর্চা ইত্যাদির জন্য ভাল নয়। তবে বিশেষ কোন একটি চিন্তার দিকে কেন্দ্রীভূত মনোযোগ সব সময় বজায় রাখার কারণেও কেউ অন্যান্য ক্ষেত্রে আত্মভোলা হয়। যেমন সারাক্ষণ অংকের সমস্যা সমাধানের উপর মনোযোগ থাকে বলে আত্মভোলা অধ্যাপক হয়তো বেশবাস, খাবার দাবার ইত্যাদিতে মনোযোগ দিতে পারেননা। ওতে তেমন কোন সমস্যা নাই, বরং জ্ঞান চর্চার দিক থেকে লাভ।

প্রশ্ন ১৯: মানুষের বড় মস্তিষ্ক তাকে কল্পনা শক্তি দিয়েছে। তাই ঘোড়া আর পাখির অনুধাবনকে সে কল্পনায় মিশিয়ে পঙ্খীরাজের সৃষ্টি করে। কিন্তু শিম্পাঞ্জির অনুধাবনে যদি পাখি ও ঘোড়া থাকতে পারে তাহলে তার কল্পনায়ও যে পঙ্খীরাজ নাই তা আমরা কী ভাবে বুঝলাম?

উত্তর ১৯: সরাসরি তা বুঝা যাবেনা। তবে পঙ্খীরাজের ধারণা যে তার আছে তার কোন আচরণে সেটি প্রকাশ পায়নি। এরকম অন্যান্য কোন কিছুর কল্পনা শক্তির কোন প্রমাণও তার মধ্যে পাওয়া যায়নি। কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি পঙ্খীরাজের অথবা বাস্তব-বহির্ভূত কোন কিছুরই কল্পনা করার ক্ষমতা তার নাই। তার মধ্যে শুধু ইন্দ্রিয় অনুভূতিতে বিরাজমান বিষয় নিয়ে ভাবার বা সাড়া দেয়ার ক্ষমতাই আমরা লক্ষ্য করেছি।

প্রশ্ন ২০: মস্তিষ্কের স্নায়ু উদ্দীপনার প্যাটার্নগুলোর মধ্যে কোডিং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সঠিক আন্দাজ করতে পারাটিকে আমরা বুদ্ধিমতা বলছি। এ কাজে অভিজ্ঞতা সহায়ক হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটি বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও অন্যদের চেয়ে বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত কেউ নিতে পারছে। এর কারণ কী?

উত্তর ২০: অভিজ্ঞতা অবশ্যই বুদ্ধিমত্তায় সহায়ক। কোডিং প্রতিযোগিতায় ইতোমধ্যে স্মৃতিতে থাকা প্যাটার্নের সঙ্গে অনুরণিত হলে তারই অগ্রগণ্যতা পাওয়ার কথা। এই অভিজ্ঞতা হয়তো সব সময় সরাসরি ঐ বিষয়টিতে না হলেও চলতে পারে। হয়তো এমন কোন অন্য

অভিজ্ঞতা রয়েছে যা এক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুদ্ধিমত্তার জন্য এদের মধ্যে সঙ্গত সম্পর্কগুলোকে খুঁজে পেতে হবে।

প্রশ্ন ২১: তথ্য জানাটা কি বুদ্ধিমত্তা? না হলে তথ্য জানার সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার সম্পর্ক কী?

উত্তর ২১: তথ্য জানা থাকাটি বুদ্ধিমত্তার সহায়ক হতে পারে, কিন্তু তা নিজে বুদ্ধিমত্তা নয়। আসলে বুদ্ধিমত্তার একটি পরিমাপ হলো জানা তথ্যগুলোর কত অংশকে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক সম্পর্ক সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করতে পারছি তা। নিরর্থক এবং সম্পর্ক-সৃষ্টি করতে না পারা তথ্যের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা বা জ্ঞান কোনটিই নাই।

প্রশ্ন ২২: আমরা অনেকে মনে করি আওয়াজ করে পড়লে মনে রাখতে সুবিধা হয়। এটি সঠিক হলে কেন সঠিক?

উত্তর ২২: এখানে আওয়াজ করা বা না করাটি কোন বিষয় নয়। স্মৃতি যতবার আমরা মনে করবো তত এটি বলিষ্ঠ হয়। তা ছাড়া মনে করার দুটি পর্যায় রয়েছে – একটি হলো তথ্য পুনরুদ্ধার করা আর অন্যটি পুনরুদ্ধারের পর একে চিনতে পারা। বার বার এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে, যেমন বার বার পড়লে এই চেনার কাজটি সহজতর হয়। তবে সেটি অনুধাবন করে পড়াটাই বড় কথা, যন্ত্রের মত আওড়ালে লাভ নাই– তা আওয়াজ করেই হোক আর না করেই হোক।

প্রশ্ন ২৩: বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তার উচ্চ গুণের অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে পার্থক্য দেখা যায়। এটি কি বংশগত?

উত্তর ২৩: বিবর্তনের ফলে আমরা আজকের সকল হোমো সেপিয়েন্স মানুষ উন্নত একটি মস্তিষ্কের অধিকারী হয়েছি যা সাধারণ ভাবে উচ্চ বুদ্ধিমত্তা ও অন্যান্য গুণের পরিচয় দেয়। এর মধ্যে মানুষে মানুষে যে তফাৎ দেখা যায় তা মূলত পরিবেশ ও চর্চা জনিত। যে সমাজে বা পরিবারে একজন মানুষের বাস তার কালচার ও সুযোগ সুবিধাই ছোট বেলা থেকে তার বুদ্ধির বিকাশকে প্রভাবিত করে থাকে। বাস্তব ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে কোন দেশের অশিক্ষিত ও সুবিধাবঞ্চিত কোন পিতামাতার সন্তান অন্য উন্নত পরিবেশে মানুষ হলে উচ্চ মেধা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে। জেনেটিক কারণে এর ভঙ্গি বা নিজস্ব প্রবণতার মধ্যে কিছু পার্থক্য আসতে পারে। কিন্তু মূলত ব্যাপারটি চর্চার আর পরিবেশের অন্তর্গত।

প্রশ্ন ২৪: আমাদের চেতনাটি যদি মস্তিষ্কের বিষয় হয় তার মানে মস্তিষ্কের বাইরে কি আত্মা বলে কিছু নেই?

উত্তর ২৪: বিজ্ঞানীরা এখন আত্মাকে মস্তিষ্কজাত এই চেতনা বলেই মনে করছেন। কিন্তু মস্তিষ্কের শারীর-বৃত্তের ভিত্তিতে চেতনার পূর্ণ তত্ত্ব তাঁরা এখনো প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি বলে অন্তত এই বিষয়টিতে তাঁদের জ্ঞান এখনো অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

প্রশ্ন ২৫: একজনের আবেগ অন্যের মধ্যে অনুরূপ আবেগের সৃষ্টি করে। কিন্তু কখনো কখনো তো আমরা উল্টোটাও দেখি যেমন কারো কান্না দেখে অন্য কারো হাসি পায়। এটি কেন?

উত্তর ২৫: প্রথমটি স্বাভাবিক ভাবে, অনেকটা স্বয়ংক্রিয় ভাবেই ‘মিরর নিউরোনের’ কাজের দ্বারা হচ্ছে– একজনের আবেগ অন্য জনের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে। উল্টোটা কিন্তু স্বয়ংক্রিয় ভাবে হয়না, বরং সুচিন্তিত ভাবে হয় অন্য কোন চিন্তার প্রভাবে, ভিন্ন কোন লক্ষ্য নিয়ে- যেমন হয়তো কাউকে তার কান্না নিয়ে লজ্জা দেয়ার জন্য। বিবর্তনের ফলে আমরা যা পেয়েছি সেটিই স্বাভাবিক। তা হলো পরের আবেগে অনুরূপ সাড়া দেয়াটি। তাতে বিবর্তনগত সুবিধা রয়েছে। এর ফলে প্রাণি আবেগ দেখিয়ে অন্যদের কাছ থেকে অনুকূল সাড়া আশা করতে পারে– যা তার টিকে থাকার পক্ষে সহায়ক।

প্রশ্ন ২৬: কৈশোরে মস্তিষ্কের সম্মুখ-পিণ্ডটি পূর্ণ বিকশিত থাকেনা বলে কিছু কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। এর ফলে তাদের বুদ্ধিমত্তা বা বিচার বুদ্ধির কি অভাব ঘটে?

উত্তর ২৬: বুদ্ধিমত্তার অভাব মোটেই ঘটেনা, বিচার বুদ্ধির অভাবও নয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। যেটি হতে পারে তা হলো অন্যের মধ্যে যে দোষ বা বিসদৃশতা সে সহজে দেখতে পারে তা নিজের মধ্যে দেখতে পারেনা। আত্মপর্যবেক্ষণের এই অভাবটি তাদেরকে কখনো কখনো যেমন বেপরোয়া করে তুলতে পারে, তেমনি তাদেরকে স্বার্থহীন ভাবে দেশের বা পরের জন্য আত্মদান করতেও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। বুদ্ধিমত্তার অভাব যদি তাদের হতো তা হলে ঐ কাঁচা বয়সে সৃজনশীলতার বড় বড় উদাহরণগুলো সৃষ্টি হতো না। অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও সাহিত্য সৃষ্টির সূত্রপাত হয়েছে এই বয়সেই।

প্রশ্ন ২৭: সাম্প্রতিক পরীক্ষণ অনুযায়ী আমার মস্তিষ্ক যদি আমি সিদ্ধান্ত নেবার ৭ সেকেণ্ড আগে আমার সিদ্ধান্তটি নিয়ে নিতে পারে, তা হলে আমিটা কে? মস্তিষ্ক থেকে আমাকে আলাদা করছি কী ভাবে?

উত্তর ২৭: আমার সঙ্গে আমার মস্তিষ্কের দূরত্বটি দেখা যাচ্ছে এই পরীক্ষণ ফল থেকে। আমরা জানতাম যে আমার মস্তিষ্কের সিদ্ধান্তটিই আমার সিদ্ধান্ত। এখন দেখছি আমি সজ্ঞানে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই তা আমার মস্তিষ্ক নিয়ে রেখেছে যেটি তখন আমি জানতামনা। এটিই এখন গবেষকদেরকে ভাবিয়ে তুলছে। স্পষ্টত সিদ্ধান্তটি আমার অবচেতনে ঘটেছে, সচেতনতার মধ্যে নয়। আমার অবচেতন চিন্তার প্রক্রিয়ার মধ্যে কতখানি আমি রয়েছি সেটিই তখন নির্ণয়নের বিষয়।

প্রশ্ন ২৮: আত্মগত একান্ত চেতনার কারণে আমার সবুজ রঙের চেতনা যদি অন্যদের সবুজ রঙের চেতনার থেকে ভিন্ন হয়, তা হলে কোন জিনিস যে সবুজ এই ব্যাপারে আমরা একমত হতে পারি কী ভাবে?

উত্তর ২৮: আমরা হয়তো সাধারণভাবে কাকে সবুজ বলবো সে ক্ষেত্রে একমত হতে পারি। সেটি অনেকটা একটি বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘের আলো (সবুজ) আমাদের দর্শন কোর্টেক্সে যে সিগন্যাল তৈরি করে তারই ফলশ্রুতি– যা নিয়ে আমরা একমত হতে পারি। কিন্তু এই সিগন্যাল আমার অন্তর্চেতনায় কী ভাবে কাজ করছে সেটিই আমার নিজস্ব সবুজ রঙ। তাকে এখনো ব্যক্তিগত বলতে হচ্ছে, কারণ তার সাধারণ গ্রাহ্য কোন বস্তুনিষ্ঠ তত্ত্ব এখনো দেয়া যায়নি। যদি দেয়া যেতো তা হলে ঐ তত্ত্ব থেকে যে কেউ বের করতে পারতো সবুজ রঙটি আমার অন্তর্চেতনায় কীভাবে ধরা পড়ছে।

ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণে এবং দেশের তরুণ তরুণীদেরকে বিজ্ঞানমনস্ক করার ক্ষেত্রে একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। এজন্য তিনি লেখালেখি, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যবহার, বিজ্ঞান সাংবাদিকতা, বিজ্ঞান বক্তৃতা ইত্যাদি সব মাধ্যম ব্যবহার করেছেন গত পাঁচ দশক ধরে। 'মহাশূন্যে মানুষ' এই পুস্তকমালাটিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেয়া তাঁর একটি বিজ্ঞান বক্তৃতামালার ভিত্তিতেই রচিত। ষাটের দশকে তিনি এদেশের প্রথম জনপ্রিয় বিজ্ঞান মাসিক 'বিজ্ঞান সাময়িকী'র প্রতিষ্ঠা করেন, যা তাঁরই সম্পাদনায় এখনো প্রকাশিত হচ্ছে। সত্তরের দশকের শেষের দিকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন একটি অনন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র (সিএমইএস), নিজে কর্ণধার থেকে যাকে তিনি পল্লী-বাংলার সুবিধাবঞ্চিত তরুণ তরুণীদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা ও হাতে কলমে জীবিকামুখি প্রযুক্তির বিস্তারে একটি সুযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন।

বিজ্ঞান সাহিত্যের জন্য বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার সহ বিভিন্ন স্বীকৃতি প্রাপ্ত এই লেখকের লেখনী শুধু তাঁর নিজের বিষয় পদার্থ বিদ্যার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং আধুনিক বিজ্ঞানে অতি ফলপ্রসূ বিভিন্ন শাখার অগ্রগতি নিয়ে তাঁর বুঝিয়ে বলার প্রচেষ্টা ও লেখার স্বচ্ছন্দ গতি রয়েছে। তাঁর প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক বই এবং প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক। বাংলাদেশে বিজ্ঞান চেতনা, বিজ্ঞান সাহিত্য, তরুণ তরুণীদের সক্রিয় বিজ্ঞান আন্দোলন কী ভাবে এগিয়েছে, তাঁর সম্পাদিত 'বিজ্ঞান সাময়িকী'তে এবং তাঁর রচনায় তার একটি ধারাবাহিক আলেখ্য পাওয়া যায়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক।